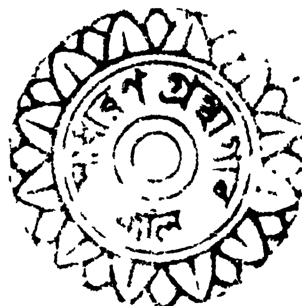


হাড়ি-মুচি-ডোম

হাড়ি-মুচি-ডোম

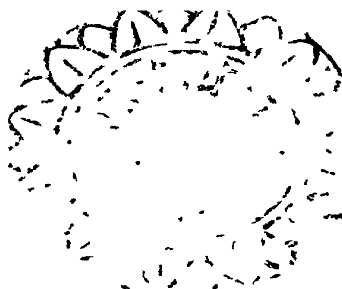
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

দি বুক এমপোরিয়ম লিমিটেড

প্রকাশক : প্রসাদকুমার সিংহ
দি বুক এমপোরিঅম লিমিটেড
২২।১ কর্নওঅলিস স্ট্রীট, কলিকাতা ৬

দাম আড়াই টাকা

মুদ্রাকর : শক্তি দত্ত
দি প্রিন্টিং হাউস
৭, শুক্ স্ট্রীট
কলিকাতা ৫



গ্রন্থকারের নতুন উপন্যাস ঃ

যে যাই বলুক

যায় যদি যাক

নতুন গল্প ঃ

যতন বিবি, ১৩৫১

কালো রক্ত, ১৩৫২

কাঠ-খড়-কেরাসিন, ১৩৫২

আসমান-জমিন, ১৩৫৩

এই গল্পগুলির রচনাকাল ১৩৫৩

সূচীপত্র



মেথর-ধাঙড়

‘পরাণের হুঁকা রে,
কে রাখিল তোর নাম ডাব্বা রে—’

গলা ছেড়ে গান গাইছে গাড়োয়ান, গোঁ-গাড়ির গাড়োয়ান। গাইছে আচ্ছন্নের মত। খড়ের গাদা নিয়ে যাচ্ছে বোঝাই করে। বাবুই ঘাসের বাঁধের সঙ্গে হুঁকোটা লটকানো। রথের ধ্বজার মত। হুঁকোটা চোখের সামনে নেই, কিন্তু মন জুড়ে রয়েছে। কতক্ষণে পথ ফুরাবে না-জানি। গাছের ছায়ায় বসবে বন্ধুকে নিয়ে। অদিনের বন্ধু।

গাঁ ছেড়ে শহরের হুদ্দার মধ্যে গাড়ি এসেছে।

‘কে যায়? এই রোকো।’ মওড়া নিল ধনপতি। হাঁকার দিয়ে উঠল।

ভাল গাড়ির টানে পিছের গাড়ি যায়। সবাই দাঁড়িয়ে পড়ল লাইন দিয়ে। কি ব্যাপার?

কী ব্যাপার? মুনসিপালটির ইলেকার মধ্যে এসে পড়েছ, গাড়ি পাশ করাতে হবে না?

ধনপতি মুনসিপালটির ট্যাক্সো-দারোগা। গরুর গাড়ির ট্যাক্সো আদায় করে। কোথায় গরুর গাড়ির আঁট, কোথায় গাড়ি মোড় ঘোরে—রঁদ দিয়ে বেড়ায়। দেখতে পেলেই চিলের মত ছোঁ দিয়ে পড়ে।

মুনসিপালটির রাস্তার মধ্যে এসে পড়লেই গাড়ির টিকিট কাটতে হবে। প্রতি গাড়ি বারো আনা। মাটির রাস্তা

ছেড়ে সুরকির রাস্তায় এসেছ, খাজনা দিতে হবে না? গরুর গাড়ির চাকায় বাঁধা রাস্তা ধ্বসে ভেঙে যাচ্ছে না? মেরামতি-মেহনতি কে দেয়?

টিকিট নেবে না কি। পাঁচ আইনে চালান হবে। আইনের আমল পরের কথা, আগে লাঠির আমলে এস। পাঁচন কেড়ে নিয়ে ধনপতি মারলে এক ঘা।

ধনপতির সে এক খাণ্ডার মূর্তি। টিকিট কেটে বেঁধে দিলে শলির মধ্যে। পাশ করিয়ে দিলে।

সব সময়েই কি ধনপতির এমন রণমুখো চেহারা?

কে বলে?

মেথররা বলে, ধনপত সাহেব আমাদের মাটিয়া ঠাকুর। আমাদের মরা-হাড়ায় বিমারে-বোখারে তিয়াসে-উপোসে ও আমাদের বাপ-মা।

খোসামোদ করে বলে না। মনের থেকে বলে।

কেন বলে?

'যারা নরক ঘুচিয়ে বেড়ায় তাদেরই নরক ঘোচে না সংসারে।' পাগড়ি মাথায় ধনপতি চলে আসে মেথর-পটিতে। চলে আসে খবরগিরি করতে।

তার হাত-ভরা নানান রকম কাগজ-পত্র, মুড়ি-চেক, হিসেব-কিতেব। জামার বুক-পকেটে নোটের থাক। পাগড়ির ভাঁজে পেন্সিল গোঁজা।

কার-কার টাকার দরকার ?

পেরুয়ার ছু'দিন ধরে ঠেঙ্গা জ্বর, কাজে বেরুতে পাচ্ছে না। এই নে এক টাকা। সোনেলাল মদ পিয়ে হাতের পয়সা সব ফুঁকে দিয়েছে, উনুন জ্বলে না, বাজার বেসাত হবে না কিছু। এই নে আট আনা। মিলিটারি হাসপাতালে কাল হয়েছে ফেকুরামের। মাটি দিতে হবে। ঢাকনের কাপড় লাগবে। এই নে ছু'টাকা।

খাতার পাতায় ঘষে-ঘষে ভোঁতা পেন্সিল ধার করে হিসেব লেখে ধনপত।

আর-আর কেউ দাঁড়ায় পাশ ঘেঁষে। হাত বাড়াবার জন্যে উসখুস করে।

'হোবে, হোবে, ছু-চার দিন হামাকে জিরেন লিতে দে। বেশি ঠেকাঠোকা হয় যাবি আমার সেরেস্তায়। শিলিপ দেব।'

মেথররা ঘিরে দাঁড়ায় ধনপতিকে। খুশিতে সোরগোল করে। ধরে তো ধনপত, করে তো ধনপত—ধনপত ছাড়া আমাদের কেউ নাই তিরিসংসারে। চেয়ারম্যান ফত্তোলবাবু, ছু'আঙুলে কেবল টাক চুলকায়। ডাগদর যে একজন আছে সে তো লাট সাহেবের ভায়রা, বলে, ইস, আমি যাব মেথর-পটিতে রুগী দেখতে ? সাতগুষ্টি মরে যাবে তো ফিরেও দেখবে না। আর আছে টোপ-মাথায় ওভারসার বাবু, সে তো ঠেঁটি পরে ঘুরে বেড়ায় সাইকেলে। আমাদের থাকার মধ্যে আছে এই ধনপত। ধরে তো ধনপত, করে তো ধনপত।

'তুমি মাথায় পাগড়ি পিন্দেছ কেন? কেমন পেয়াদা-পেয়াদা মনে হয়।'

'আরে, এ পাগড়ি হল একঠো বাহার। মাথার উপর বাবা বরত্‌মান। বাবা বম ভোলা।'

হেসে ওঠে সবাই।

এমনি খোসগল্প করে ধনপতি। বলে, 'আমার বাতটা সমঝাইলে না? বাপ ছেলিয়ায় দুখ-দবদ সামলিহে চলে তো? তেমনি এ পাগড়ি দু'-একটা লাঠির বাড়ি জরুর সামলাহে লিবে। তার পর ফাটলে-চোটলে বাণ্ডিজ হোবে, সাপ ছোবলালে দড়ি পাকাবে, নদী পারে কোপনি হোবে, গর্মিকালে পঙ্খা হোবে—'

বলতে বলতে হাসতে হাসতে চলে গেল ধনপতি।

আর অমনি পেরুয়া আর সোনেলাল আর ফেকুরামের ছেলে বাঙাড়ী চলল মাতালশালায়। হাতে করকরে কাঁচা পয়সা। এক গলা না খেয়ে নিলেই নয়।

জীবন-ভোর এই মদের তিয়াস। মাসে তিরিশ দিন। ভাত হবে না না-হোক, কিন্তু চাই পচুই আর রস্থুই। ভেতো মদ।

দিগেন সার মদের দোকান। ঠিক মেথর পটির লাগ-পাশে। পোড়া-পোড়া করে চাল সেদ্ধ করে চ্যাটাইয়ে মেলে দেয় রোদ্দুরে। বাখর গুঁড়ো মেশায়। আবার ভাপে সেদ্ধ করে মদ করে।

এদের সুখের সায়র দৈবে শুকিয়ে গেছে, তৃষ্ণায় প্রাণ আইঢাই। গলায় আধ সের ঢেলে দাও, সরকার।

সকালাবলা ভিজে ভাত খেয়ে বেরিয়ে যায় স্ত্রী-পুরুষে। যার-যার ইলাকা ঠিক আছে। যার-যার যজমান। মেয়েরাও বেরোয় বলে সকাল বেলা রান্না হয় না। পুরুষেরা প্রথমে যায় বাজারে—রাস্তার গোঁজা সাফ করে ; মেয়েরা যায় বরাদ্দ ধোলাইয়ের কাজে। ঘুরে-ঘুরে ধোলাইয়ের কাজ সেরে মেয়েরা বাড়ি ফিরে যায় রান্নার জোগাড়ে। রাস্তা থেকে পুরুষদের ময়লার কাজে যাবার কথা। কেউ যায়, কেউ যায় না। খুঁজে বেড়ায় কোথাও বাংলা কাজ আছে কি না। মুনসিপালটির যে-যে ওয়ার্ডে ল্যাট্রিন-ট্যাক্স নেই সে-সে পাড়ায় কারু-কারু ডাক আসে। তাও কালে-ভদ্রে। বেশির ভাগ লোকই মাঠে সারে।

ফালতু কাজ যে-দিন পায় মন্দ রোজগার হয় না। সারা দিন খেটে-পিটে হেলন্ত বেলায় মাতালশালায় গিয়ে ঢোকে। কাতারবন্দী হয়ে বসে। ডোমেরা—মানে যারা মুদ্দোফরাস—তারা মেথরের চেয়ে নিচু, বসে তারা একটু ফারাক হয়ে। হাড়িরা সব চেয়ে উঁচু, মেথরের তারা মহাজন, মেথরকে তারা শুয়োর বেচে—তারা বসে আগ বাড়িয়ে।

যে যেখানেই বোসো, ভাঁড়ে-গেলাসে খেতে পাবে না। অশুচি এঁটো ভাঁড় ফেলবে কোথায়? আর, বাড়ি থেকে যে আনবে তার ফুরসৎ কই? আর, ঘড়াঘটি গেলাস-ফেরো

আছে না কি কারুর? শুধু কেলে-হাঁড়ি আর মাটির কলসি। তা ছাড়া, যাবে তো পেটে, অত ঠাট-বাটে দরকার কি।

দরকার নেই। গলা উঁচু করে হাঁ করে বসে থাকো। এক ঢোঁকেই রেশি নিতে চাও কখনো, বোসো হাঁটু গেড়ে।

পাঁচ আনা করে সের। বাটখারাতে ওজন করে দেয় দিগেন সা। ছোঁয়া বাঁচিয়ে ওপর থেকে ঢেলে দেয় সরকার। ঢক-ঢক, ঢক-ঢক-ঢক।

'যারা নরক ঘুচিয়ে বেড়ায় তাদেরই নরক ঘোচে না সংসারে।'

মদ খেয়ে এই নরকের যন্ত্রণা থেকে ত্রাণ খোঁজে।

টলতে টলতে বাড়ি ফেরে। ফিরেই বলে, গরম ভাত দে। বৌরা আশা করে থাকে হয়তো তাদের জন্য নিয়ে আসবে কিছু ভাঁড়ে করে। সোয়ামীরা বলে, আমদানি কিচ্ছু নেই। আর দু'টো দিন সবুর কর—

থাবা-থাবা ভাত খেয়ে এঁটো মুখ-হাত ভাল করে ধুয়ে-না-ধুয়েই শুয়ে পড়ে তালাইর ওপর।

স্ত্রীরা আশা করে থাকে সোয়ামীরা মাছ তরকারি চাল-ডাল নিয়ে আসবে। কিন্তু যা নগদান রোজগার করে সব যায় মদের অন্দরে। এক পয়সাও ফেরে না। তখন ধনপতের খোঁজ পড়ে। বলে, শিলিপ দাও।

ধনপত শিলিপ কাটে। শিলিপ যায় যাদু ঘোষের মুদিখানায়। যাদু ঘোষ প্রতি টাকায় এক আনা করে মাসিক

সুদ আদায় করে। নামে-নামে হিসেব রাখে। ধনপতের আট আনা বখরা।

ঘরগুষ্টি জ্বরে পড়েছে, ছেলে একটা মরেছে কি হয়েছে—নগদ টাকা চাও, ধনপত পত্রপাঠ দাদন দেবে। কিন্তু টাকায় ঐ এক আনা সুদ। এক টাকা ধার তো পনেরো আনা পাবে—হাতে কেটে নিয়ে তবে দাদন। সুদের চিন্তা কে করে? এখন সমূহ বিপদ থেকে তো বাঁচাও।

ধরে তো ধনপত, করে তো ধনপত। আঁচায়-বাঁচায় ধনপত।

একসামিলী চালানে মেথরদের মোট মাইনে ধনপতই ট্রেজারি থেকে বের করে আনে। ট্রেজারির বাইরে রাস্তার উপর গাদি মেরে বসে থাকে মেথর-মেথরানি। কাটাকুটি হয়ে কার কত মিলবে কারুরই কোনো হদিস-নুটিশ নেই। নাম ধরে-ধরে নিখুঁত হিসেব করে রেখেছে ধনপত। সুদ-আসল মুশমা দিয়ে নিট করে রেখেছে। তুই লালচাঁদ তেরো আনা, তুই বিলাসী সাত সিকে, মুঙ্গিয়া দু'টাকা, তুই ঝুলনি সাড়ে আট আনা—

ঝুলনি মুখ ম্লান করে বলে, 'মোটে সাড়ে আট আনা!'

ধনপত ঠাণ্ডা গলায় বলে, 'হিসেবে আমার কালির আঁচড়েও ভুল নেই। গেল মাসে তোর বেটা-বিটি মরে গেলে না জ্বর হয়ে? ওষুধ খাওয়ালি না? মাটি দিলি না?'

'অত কচাল কিসের?' বলে উঠল বিরিজলাল: 'নেবেও

ধনপত দেবেও ধনপত। ধনপত ছাড়া আমাদের গতিমুক্তি কই?'

ঝুলনি যত্ন করে আঁচলের গিঁটে পয়সা বাঁধে।

তনখা কত তোদের?

জিগগেস করে স্বদেশী বাবু। আমাদের মণিলাল। জমিদারের ছেলে। বেকার বসে না থেকে দেশের কাজে লেগেছে। দেশের কাজ মানেই দুঃস্থ-দুঃখীর কাজ। আর সব চেয়ে অধন-অধম, সব চেয়ে অধঃপেতে আর কে আছে এই মেথর-ধাঙড় ছাড়া?

তনখা বলতে বারো-চোদ্দ, ভাতা বলতে পাঁচ টাকা। এতে কী হয়? এতে তো জল গরমও হয় না।

ক'ঘর আছিস তোরা?

আগে প্রায় পঞ্চাশ ঘর ছিনু। আকালের বছর বহুৎ উজাড় হয়ে গেল। মাটি দেয়া গেল না, বাঁশে বেঁধে একে-একে নদীতে ফেলে দিয়ে এনু। এখন আছি মোটে কুড়ি-বাইশ জন—জরু-খসম নিয়ে। হাড়-জিরজিরে গা, শরীর একেবারে নাই হয়ে গেছে। জোয়ান-ভর্তি বয়সের যে ক'টা মেয়ে ছিল ব্যামোয়-ব্যামোয় জেরবার হবার আগেই পাঠিয়ে দিনু শহরে-বাজারে, কলকাতায়। তবু খেয়ে-পরে থাক বেঁচে-বর্তে। এইখানে পড়ে আছি আমরা বুড়ো-হাবড়া আর ক'টা গুঁড়োগাড়া। ছেলে যে ক'টা বড় হচ্ছে বিয়ে-সাদি

হতে পাচ্ছে না। বউ আনতে হয় ডুমকা নয়তো ভাগলপুর থেকে, কিন্তু বউ কিনে আনি তেমন পয়সা কই? তারা আসবে কেন এই ভাগাড়ে? বলে, খেতে খুদ নেই বসতে পিঁড়ে।

তোমাদের সর্দার কে?

সর্দার বিরিজলাল।

তন্তুসার চেহারা, রোগে-রোগে ধুঁকছে, ঢকঢকে হয়ে গেছে। সমস্ত গায়ে খোস-চুলকানি। এক দণ্ড স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারছে না, সব সময়েই খসখস ঘসঘস করছে।

শুধু একা আমার নয় হুজুর। ঘরগুষ্টি সকলের এই খুজলিপাঁচড়া।

দেখুন এই ঘর-দোরের অবস্থা। মাটির মেঝে, মাটির দেয়াল, খ্যাঁড়ের চাল। জায়গায়-জায়গায় খড় খসে পড়ছে, বাদলা হলে নালে জল পড়ে। ঐ দেখুন সব ফাঁক-ফর্সা হয়ে আছে, এখনো মেরামত হল না। এ কি মানুষের ঘর-দুয়ার? না আঁটকুড়-পাঁটকুড়?

তার পর, একেকটা ঘরে একেকটা পরিবার। এক ঘরেই শোয়া-বসা খাওয়া-পরা জনম-মরণ। আড়াল-আবডাল নেই। এক কোণে ছেলে হচ্ছে, আরেক কোণে মরছে। বাপ-মা মেয়ে-জামাই ছেলে-বউ সব এক কামরা। ঘেরা-বেড়া নেই, সব এক সামিল।

শুধু কি তাই? এই দেখুন দেয়ালে-মেঝেতে ছারপোকা

থিক-থিক করছে। কেঁথা-কানি, তালাই-চাটাই এমন কি রুটি-চাপাটির মধ্যে ছারপোকা। আর মশা? সন্ধ্যে হবে, মনে হবে ঝম্প বাজছে। বাঁচি কি করে? ভুলি কি করে? ঘুমে অসাড় হয়ে যাই কি করে?

মানুষেয় অধঃপাতে যাওয়া কাকে বলে মানুষ হয়ে দেখছে তাই মণিলাল। এর প্রতিকার কি?

মেথরের দল শূন্য চোখে চেয়ে রইল।

'চেয়ারম্যানকে বলেছ?'

বলে-বলে হদ্দ। কিছু করেন না। শুধু ঠেঙা মেরে কথা বলেন। বলেন, হাকিম নিম-হাকিমদের সঙ্গে খাতির-পীরিত করবার জন্যে চেয়ারম্যান হয়েছি, চেয়ারম্যান হয়েছি কি মেথর-মুদ্দোফরাসের ঝামেলা পোহাতে?

'ভাইস-চেয়ারম্যান?'

সে আছে তদন্ত-তদবিরে। কে নক্‌সা-মত দেয়াল তুলছে না, কার পাইখানা রাস্তার উপর উঠে আসছে তার তালাসে-নালিশে। এক কথায় ঘুষের ফিকিরে। আমরা কিছু বলতে গেলে বলে, খোদ থাকতে আমার কাছে কেন?

'ডাক্তার?'

গায়ে হাত ঠেকাবে না, ছোঁয়া লেগে জাত যাবে। এমন কি বুকে জাড় লাগলেও কম্পাস লাগিয়ে দেখবে না আমাদের বুক-পিঠ।

'আর ওভারসিয়ার বাবু?'

ও তো লাটসাহেবর ছোট নাতি। মাথায় ধুঁচনি এঁটে সাইকেল মারবে রাস্তায় রাস্তায়। আর ফন্দি খুঁজবে জরিমানা করতে পারে কি না।

'তবে তোমাদের দেখে-শোনে কে?'

'দেখে তো ধনপত, শোনে তো ধনপত। আর আমাদের কেউ নেই।'

'কিন্তু ও তো টাকায় এক আনা করে সুদ নেয়।' ঝাঁজিয়ে উঠল মণিলাল।

তা নেবে বৈ কি। নইলে ঘরের টাকা সে দাদন দেবে কেন? কম সুদে আর কে দিচ্ছে তাদেরকে? মরা-হাজায় ব্যামো-পীড়ায় মদে-ভাঙে আর কার কাছে গিয়ে তারা হাত পাতবে? সুদের হার চড়া বেখেছে বলেই তো রাশ রেখেছে একটা, নইলে কবে দফা নিকেশ হয়ে যেত। হাঁড়িতে আর চাল চাপত না, ঘসি-কাঠি জোগাড় হত না উনুনের। ওষুধ আসত না এক ফোঁটা।

'যা পেতাম তা মদ খেয়েই টেঁসে দিতাম।'

'মদ রোজ চাই?

'বারো মাস, তিরিশ দিন। নোংরা ঘেঁটে এসে—যেখানে আমরা ঘাঁটি নি—সে জায়গা যে আউর ভি নোংরা। যদি মদ না খাই সে নোংরা আমরা ভুলি কি করে? ঘর আঁধার করে দিয়ে ঘুমাই কি করে অজ্ঞানের মত?'

'আগে তোমাদের এখানে কাবলিওয়ালা আসত?'

'ও, অনেক। ও শালারা সব পালিয়ে গেছে।'

'যায়নি পালিয়ে। ধনপত সেই কাবলিওয়ালার সাকরেদ। কাবলিওয়ালার পাকানো লাঠি এখন তার হাতে বেঁটে পেনসিল হয়েছে।'

ছি ছি ছি, এ কি কথা। এ বাত ঠিক নয়। ধনপত তাদের দেবতা। ফাগুন মাসে তারা যে সূয্যি-পূজো করে সেই সূয্যিঠাকুর।

মণিলাল এক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে রইলো। বললে, 'মাইনের টাকা পাও কত হাতে?'

কেউ বারো আনা, কেউ দেড় টাকা, কেউ বড় জোর ন' সিকে।

সতেরো টাকার মধ্যে? বাকী টাকা যায় কোথায়? ধনপতের পাগড়ির ভাঁজে। পাগড়ি ফুঁড়ে পেটের মধ্যে।

তা ছাড়া উপায় কি। সারা মাস হাওলাত করে খেয়েছি তার উশুল নেবে না ধনপত? হাওলাত না করে উপায় কি আমাদের? বাংলা কাজ যা পাই মদ খেয়ে বাজারের জন্যে কিছুই বাঁচাতে পারি না। বালক বেলা থেকে মদ খাচ্ছি; পালে-পরবে, শ্রাদ্ধে-ভোজে তেজী হয়ে ওঠে মদের খাঁই। আমাদের মদ ছাড়তে বলাও যা, মহাজনকে সুদ ছাড়তে বলাও তাই। আর এ মহাজন সুদ নিলে কি হবে, তদবির-তদারকও এ-ই করে। শিলিপ কাটিয়ে মুদি-দোকান থেকে

চাল-ডাল তেল-নুন বাড়ি পাঠায়। উটকো ডাক্তার ডাকায়। ঘর-দোর সায় করে।

যদি বলতে হয় চেয়ারম্যানকে গিয়ে বলুন। চেয়াবের পায়া ভেঙে দিন। ভাইস-চেয়ারম্যানের ঘুষ নেয়া বের করে দিন। ডাক্তারের হাত থেকে কেড়ে নিন কম্পাস। টুপি-মাথায় ওভারসিয়ারকে নামিয়ে দিন সাইকেল থেকে। গরিবের বন্ধু ছোট-চাকুরে এই ধনপত—তার পিছে লাগা কেন? গরিবের তত্ত্বতালাস করে যে, গরিবের সঙ্গে ওঠা-বসা করে যে, তার যত অপরাধ। আর তোমরা যারা বড়লোক—চেয়ারম্যান আর কমিশনার—তোমাদের কোনো জবাবদিহি নেই।

'কিন্তু', মণিলাল খুশিমুখে বলল, 'ঐ বড়লোকেরা যদি না শোনে, তা হলে—?'

তা হলে আর কি। এমন করে খসে-খসে পচে মরব।

'তোমরা শুয়োর খাও না?'

'পাই কোথায়? দর-দাম ঠাণ্ডা নেই আজকাল।'

'খেতে বলছি না। কিন্তু শুয়োর কী ভাবে থাকে দেখেছ তো?'

'দেখব কি। সেই ভাবেই আছি আমরা।'

'কিন্তু এ ভাবে থাকবার দিন দূর করে দিতে হবে জোর করে। তোমরা স্ট্রাইক করবে।'

'টাইট' করবে। এমন কথা শুনেছে তারা হাওয়াতে।

'টাইট' করলে দুর্দিনের জগদ্দল পাথর সরিয়ে দিতে পারবে তারা।

বেশি কিছু চাই না। ঘর বাড়াতে হবে, চাল ছাওয়াতে হবে, মাইনে বাড়াতে হবে পাঁচ টাকা।

'যাতে, আমদানি ভাল হলে, আমরাও একটু পিতে পারি দারু-উরু।' বললে মেথরানিরা।

জটিল মামলা সওয়াল করবার সময় দু'আঙুলে টাক চুলকোন ননী বাবু। বলেন, করি কী বল ? মিউনিসিপ্যালিটির আয় কই ? ময়লার গাড়ি ভেঙে পড়ে আছে কিনতে পারি না। বারে-বারে জলের ট্যাঙ্ক যাচ্ছে ফুটো হয়ে, মেরামতির মাশুল নেই। কলকজার দাম বেড়ে গেছে দু'শো গুণ।

শুধু মানুষের কলকজাই জং ধরে অচল হয়ে যাক। বাকি ওয়ার্ডগুলোতে ল্যাট্রিন ট্যাক্স বসান না কেন ?

ট্রেঞ্চিং গ্রাউণ্ড কাটাতে হবে যে। তার পয়সা কই ?

এমনি জেনারেল রেট বাড়িয়ে দিতে বাধা কি ? প্রফেসন্যাল ট্যাক্সও তো বসেনি এখনো।

ওরে বাবা, আবার ট্যাক্সো! তা হলে আগামী মেয়াদে আর রিটার্ন হতে পারব না। জানো তো, দু'বছর উকিল এক বছর মোক্তার—এই প্যাক্ট হয়ে আছে এখানে। আমার আরো এক মেয়াদ বাকি। তোমার কানে-কানে বলি, সে কি আমি খোয়াতে পারি ?

আর কিছু না পারেন, ধনপতিকে ডিসমিস করুন। শুষে-শুষে শেষ করলে সে ধাঙড়দের। টাকায় এক আনা করে মাসে-মাসে সুদ নেবে এমন আইন আবার চালু হল কবে? এক হাত ঘাড়ে এক হাত পায়ে—এমন বদমাস আর দেখা যায় না।

তাই না কি? কই, মেথররা তো নালিশ করেনি কোনো দিন! ননী বাবু বোকা সাজলেন: 'আমরা বরং জানি ধনপতি ওদের ঝক্কি নিয়ে আছে, আপদে-বিপদে বুক দিয়ে পড়ছে। তাই না রে বিরিজলাল?'

ভেজা বেরালের মত চেহারা করে আছে বিরিজলাল, মোক্তারের পিছে মুহুরির মত। কী কথা বলা ঠিক হবে কে জানে।

চোখ চেয়ে তোলান দিতে লাগল মণিলাল। বিরিজলাল বললে, 'ওই তো আমাদের সব দুঃখ-ধান্দার মূল, বাবু। আমাদের মাইনের টাকা ঘরে আনতে দেয় না। কর্জ খাইয়ে নাজেহাল করে রাখে।'

প্লাস-মাইনাস চশমার কোন অংশে চোখ রেখে বিরিজলালের মুখের দিকে তাকাবেন পলকের জন্যে ননীবাবু ঠিক করতে পারলেন না।

গর্বে মণিলালের বুক ফুলে উঠল। বোবার মুখে বোল ফোটাতে পেরেছে। এখন খোঁড়াকে দিয়ে পাহাড় ডিঙোতে হবে।

ভাইস-চেয়ারম্যান কোথায় ?

সে গেছে এনকোয়ারি করতে। তার বারো মাস এনকোয়ারি। কে মুনসিপালটির মাটি কাটল, নর্দমা মারল, রাস্তা ঠেলল তার সরজমিন তদন্ত। তার মানে, হাতে-হাতে কিছু দাও, ফর্সা রিপোর্ট যাবে।

আর, কমিশনর বাবুরা কোথায় ?

তারা সব কনট্রাকটরের বাড়িতে। বেনামদারের মুনফা নিতে।

আর, আপনি বুঝি ডাক্তার ?

নামটা শুনতে অমনি জমকালো। খুদ খেয়ে দুধের ঢেঁকুর তুলছি। মাইনে মোটে কুড়ি টাকা। পোষায় না, মাশায়। ওরা-আমরা সব এক দলে। যেমন কন্যা রূপবতী তেমনি পাত্র মাধা তাঁতি। স্ট্রাইক করিয়ে দিন, মাশায়।

তা আর বলে দিতে হবে না আপনাকে।

ঐ, ঐ যাচ্ছে লাট সাহেবের ছোট নাতি। টোপ মাথায় ওভরসিয়র বাবু।

ওকে ধরে কী হবে ? কাশতে গেলে কোপনি ছেঁড়ে। ওর কী মুরোদ।

ধনপতি কোথায় ?

ধনপতকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ধনপত পালিয়ে বেড়াচ্ছে। দেখ একবার মজাটা। আগে দেনদার পালিয়ে বেড়াত, এখন মহাজন পালিয়ে বেড়াচ্ছে।

দরকার নেই জবাবদিহিতে, তর্কাতর্কিতে। কথা ছেড়ে কাজ করো। নিজের পায়ে দাঁড়াও।

হ্যাঁ, 'টাইট' করল মেথররা।

দাবি তাদের যৎসামান্য। ঘর না বাড়াও, সারিয়ে দাও। দাও মাগনা ডাক্তারি। আর বাড়তি মাইনে পাঁচ টাকা।

'টাইট' তো করল, কিন্তু 'টাইটে'র ক' দিন খাবে কি তারা? ধনপতের কাছে তো আর যাওয়া চলবে না।

খবরদার, কখনো না। মণিলাল হুংকার দিয়ে উঠল: 'আমি তোদেরকে টাকা দেব। আমার টাকা মানে পাঁচ জনের টাকা—তোদেরই মতন পাঁচ জনের থেকে চেয়ে আনা টাকা। আজ ওরা দিচ্ছে কাল তোরা দিবি। এ টাকা তোদের শুধতে হবে না। ক'টা দিন শুধু থাক একটু কষ্ট করে।'

'কিন্তু এক ঢোঁক মদ না খেলে চলবে না বাবু।'

'তা খাবি বই কি। তা না খেলে চলবে কেন? কিন্তু মনে থাকে যেন, ঐ এক ঢোঁক। এক-পেট করবার জন্যে যেন যাসনে ধনপতের কাছে।'

কখনো না। আকাল-মহামারী হলেও না।

কে এক হাজরা শুয়োরের পাল নিয়ে চলেছে মেথরপটির সমুখ দিয়ে। খাসী শুয়োরও আছে দু'তিনটে। বেশ মোটা-সোটা। তেলালো শুয়োর।

বিরিজলাল বেরিয়ে এল ঘরের থেকে। বেরিয়ে এল

আরো অনেকে। কত বচ্ছর শুয়োর খায়নি তারা। দেখেনি এমন চোখের সামনে।

কোথায় যাচ্ছ শুয়োর নিয়ে ?

বিলে চরাতে নিয়ে যাচ্ছি।

এ দিকে বিল কোথায় ?

ঘুর-পথে চলে এসেছি ভুল করে।

বেচবে না কি এক-আধটা ?

খদ্দের পেলে ছাড়ে কে ?

কিনতে হলে খাসীই কিনতে হয়। দাম বলে কি না পঁচিশ টাকা। অত গরমাইয়ে দরকার নেই, ঠিক-ঠাক বলো। ঘষে-মেজে আঠারো টাকায় রফা হল। কিন্তু টাকা ? টাকা কে দেবে ?

'টাইটে'র টাকা এক-আধটা করে এখনো আছে সবাইর কাছে। তাই দিয়ে চালিয়ে দাও। তিন দিন 'টাইট' হয়ে গেছে, ঢের হয়েছে। শুয়োরের কাছে আবার 'টাইট' কি। পেট পুরে মদ খাব না বুঝি, কিন্তু মাংস খাব না এমন কড়ার নেই। দিয়ে দে যার কাছে যা আছে। পথ-ভোলা শুয়োর এমন মিলবে না হামেসা।

চাঁদার টাকা চাঁদা করে দিয়ে দিল সবাই।

হা-রা-রা-রা-রা-রা। পুরুষ-মর্দ সবাই বেরিয়ে এল লাঠি আর হলকা নিয়ে। তাড়াতে-তাড়াতে মারতে-মারতে বাছাই শুয়োরটাকে ফেলে দিলে ডোবার জলে। জলে চুবিয়ে

মারলে। এদিকে শুয়োরের আর্তনাদ ওদিকে মেথরদের গাঙাড়ি।

মরা শুয়োরটাকে এবার আগুনে ঝলসাতে হবে। আগুন করবে কি দিয়ে? আর কিছু না পাও চালের থেকে খড় টেনে নাও। চাল এমনিতেও ফাঁক অমনিতেও ফাঁক। যে যেমন পারল টেনে আনল খড়ের গোছা। আগে এক নালে জল পড়ত, এখন না হয় ঝোরে-ঝোরে পড়বে। ও প্রায় একই কথা।

লাল টকটকে করে পোড়ানো হয়েছে চামড়াশুদ্ধ। এবার বনাও, কাটো। বঁটি আনো, চাকু আনো। ভাগ-বাঁট করো। ঝামা দিয়ে ঘষে-ঘষে রোঁয়া তুলে ফেল।

মাংস হল, মদ হবে না?

ওরে বাবা, মদ না হলে তো সব মাটি। দিগেন সা মদের দাম কমিয়ে দিয়েছে এক আনা। দে, কার কাছে কি আছে বার কর এই বেলা। না থাকে তো ঘটি-বাটি বাঁধা দে। কালকের কথা কালকে, আজকে তো ফুরতি করে লি।

ঘরে-ঘরে পেঁয়াজ-রশুন ঝাঁই-মরিচের গন্ধ বেরুচ্ছে। ধিয়া তাধিয়া তাধিয়া নাচছে মেথররা। মদ খেয়ে নেশায় ভোঁ হয়ে আছে কেউ। কাজিয়া-ঝগড়া করছে কেউ-কেউ। কেউ গাল-কুবাক্য করছে। বড় ফুর্তির দিন আজ।

আজ কারুর শ্রাদ্ধ-পিণ্ডি হলে হত না? কত দিন কত লোক মরেছে, শ্রাদ্ধ খায়নি তারা, শ্রাদ্ধে খায়নি এমনি

মদ-মাংস। আজ কেউ মরতে পারে না তাদের জন্যে? তবে অনায়াসে ভাবতে পারে তারা শ্রাদ্ধে-ভোজে আনন্দ করছে।

কিন্তু কে মরবে? ঠসা বুড়ো ঐ সোমরা মেথর আছে, ওকে ধরে মারো। বেঁচে থেকে ওর কোনো ফয়দা নেই। বাঁশ দিয়ে বাড়ি মারতে-মারতে ওর ঘুম ছাড়িয়ে দাও। তার পর ওর কলেজটা ছিঁড়ে নিয়ে খেয়ে ফেল মদের মুখে।

দেখল মদে তর হয়ে সোমরা মাদল বাজাচ্ছে আর গান গাইছে: ভুজঙ্গিনী রঙ্গিনী গো চিনিতে না পারি।

ঠিক। শ্রাদ্ধ করে কি হবে? তার চেয়ে বিয়ে হোক। বিয়ে হবে তো বর-কনে কই? তুত্তোর বর-কনে। 'রাঙ্গা বর মিলে কেমন রাঙ্গা কনের অঙ্গেতে। কনের বাবা ঢুলে পড়ে বরের মায়ের সঙ্গেতে।'

দূর ঝাঁটাখেকো। দূর খালভরা।

পরদিন মণিলাল তো অবাক। ঝাঁটা-বালতি হাতে নিয়ে মেথররা সব কাজে বেরিয়েছে। চালে খড় নেই, হাঁড়িতে চাল নেই, ট্যাঁকে নেই আধলা পয়সা। আবার সর্ব গায়ে সেই খসখস ঘসঘস।

সমস্ত কিছুর মূলে ঐ ধনপতের কুচক্র। বুঝতে পেরেছিস?

হ্যাঁ, বাবু।

কী বুঝতে পেরেছিস? ওই শুয়োর নিয়ে বিশে হাড়িকে পাঠিয়েছিল তোদের পটিতে। ওই দিগেন সাকে দিয়ে মদের দাম শস্তা করে দিয়েছিল। তোরা বোকা, উজবুক, আহম্মক।

হ্যাঁ, বাবু।

লাঠি ধরে শুয়োর ঠ্যাঙাতে পারিস। পারিস সোমরা বুড়োর শ্রাদ্ধ করতে। কিন্তু যার মাথার উপরে লাঠি ধরা দরকার—

হ্যাঁ, বাবু। বলতে হবে না। বুঝতে পেরেছি।

রেজেস্ট্রি আফিসে গরুর গাড়ির প্রকাণ্ড আঁট হয়। সেই আঁট থেকে ফিরছিল ধনপতি, হঠাৎ তার মাথার উপরে লাঠি পড়ল একটা। সন্ধ্যে হয়ে এলেও আর চার পাশে ঘোরালো ঝোপঝাড় হলেও লোক দু'টোকে চিনতে পেরেছে ধনপতি। পেরুয়া আরে সোনেলাল।

ধনপতি হাসল। পাগড়িটা মাথার উপরে ঠিক মত বসিয়ে বলে উঠল ঃ 'আরে, মাথার উপরে বাবা বরতমান। বাবা বম ভোলা। মাথা হোল তার ছেলিয়া। ছেলিয়াকে বাপ সামলাহে চলবে না তো কি। এক দিন মান্‌সো খেলেই কি আর গায়ে তাগদ হবে? সঙ্গে মদ খাচ্ছিস না? হাতের টিপ যে ফসকে যাবে নেশার ঘোরে। বাবার সঙ্গে চালাকি?'

কিন্তু চেয়ারম্যান অমন ঠাণ্ডা ভাব দেখাতে রাজি নয়। ঝাঁটা-বুরুশ ছেড়ে লাঠি তুলেছে বেটারা, এবার বুঝুক লাঠির কেরামতি।

ধনপতি রাজি হয় না। না হোক। চেয়ারম্যান পুলিসে খবর দিলেন।

এই তো ঠিক কথা। মণিলাল বললে মনে-মনে। যত বেশি মার খাবে তত বেশি শক্ত হবে। আর কী চাই। কথা বলতে শিখেছে, পায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াতে শিখেছে, হাতে ধরতে শিখেছে আক্রমণের লাঠি! যে ঠুঁটো সে নাগাল পেল, যে খোঁড়া সে পেল পদক্ষেপ।

মেথররা আবার 'টাইট' করলে। মদ-মাংসে এবার আর তারা ভুলছে না। তাদের পিছনে পুলিস লেগেছে যখন তখন তারাও মাটি কামড়ে মৃত্যুর সঙ্গে লেগে থাকবে। এবার চাঁদা আসবে ঝাঁকে ঝাঁকে।

ধনপতি বললে, 'এখন আমরা হেরে যাই আসুন। ওদের এক টাকা করে মাইনে বাড়িয়ে দি।'

চেয়ারম্যান ঢোঁক গিললেন: 'তুমি মাইনে বাড়িয়ে দেবার কে?'

'আমি কেউ লয়। আপনারা কমিশনর বাবুরা মিলে মিটিং করে ইস্তাহার দিয়ে দিন এক টাকা করে মাইনে বাড়ল। তার পর আমি দেখে লোব। মুনসিপালটিরও খরচ হবে না, আমারও লোকসান কমবে। মুনসিপালটিরও কাগজ-কলম আমারও হিসাব-কিতাব।' ধনপতি চোখ ছোট করল।

'যা বলেছ। আর পারি না ঝামেলা সইতে। কিন্তু মারপিটের কেস কি হবে?'

'ও আমরা তুলে লোব। চোট-জখম লাগল না, বাবা বাঁচিয়ে দিলে, তার আবার মোকদ্দমা কি।'

যা চিরদিন বলে এসেছে মেথররা—ধরে তো ধনপত, করে তো ধনপত। আঁচায়-বাঁচায় ধনপত।

ধনপত শুধু মাইনে বাড়িয়ে দিলে না, মামলা পর্যন্ত তুলে নিলে।

মণিলাল ওদের কাছে ব্যাখ্যা করতে এল, কোথায় ওদের জোর, কিসে ওদের জিত। আর ঘাসের রঙের সঙ্গে রঙ মিশিয়ে যে সাপ থাকে, চট করে চিনতে দেয় না, তার মত খল আর নিষ্ঠুর ঐ ধনপতি।

নেহি মাশায়। ও আমাদের মাটিয়া ঠাকুর। আমাদের বম ভোলা।

এবার মেয়েরা এল ধনপতির দরবারে।

বললে, 'মাইনে বাড়ল এক টাকা, কিন্তু আমাদের কি সুবিধে হল ?'

'কেন তোদেরও তো মাইনে বেড়েছে।'

'তা বেড়েছে বৈ কি। কিন্তু বুঝতে পারছি কই ?'

'কী চাস তবে ?'

'ওরা বলত, আমদানি বাড়লে মদ দেবে খেতে। এখন সোয়ামি-স্ত্রীতে এক টাকা করে দু'টাকা আমদানি বাড়ল, আমরা এখনো একপো-আধসের মদ খেতে পাবো না ?'

'বা, পাবি বই কি। তোদের কথা ভেবেই তো মাইনে বাড়িয়ে দিলাম।'

করে তো ধনপত, ধরে তো ধনপত। ধনপত তাদের ফাগুন মাসের সূয্যিঠাকুর।

'লে, এক টাকায় পনেরো আনা পয়সা লে। খা গে পেট ভরে। খেয়ে টসটোসে হ গে। এবার তোদের জন্যে আমাকে লতুন খাতা তৈরি করতে হবে। তোদেব লতুন আমদানি, আমার লতুন খাতা। এই গ্যাখ।'

মেথরানিরা হেসে উঠল। এ ওর গায়ে ঢলে-ঢলে পড়ল। ছেঁড়া-খোঁড়া ছাবা শাড়ি পরনে। অমানুষে পেয়েছে এমন চেহারা। মদের কথায় যেন তারা হারানো যৌবনের কথায় ফিরে আসে। ঝুলনি আর মুঙ্গিয়া, সুবন্ন আর বিলাসন। জ্বর-জ্বালা শোক-তাপ ভুলে যায়।

চুচ্চুরে মাতাল হয় মেয়েরা। রান্না করে না। ডাল-ভাত পুড়িয়ে ফেলে। ছেলে ঠ্যাঙ্গায়। একে অন্যের সঙ্গে খেয়ো-খেয়ি করে।

তারপর পুরুষরা যখন মাতাল হয়ে ফিরে আসে বেধে যায় মহাপ্রলয়। এ খুলে নেয় বাঁশের খুঁটি, ও খুলে নেয় বেড়ার বাঁখারি।

কি রে, এত হুড়-ঝগড়া কিসের? মণিলাল নয় ধনপতিই ফিরে আসে মেথরপটিতে।

'যারা নরক ঘুচিয়ে বেড়ায় তাদেরই নরক ঘোচে না সংসারে।' বলে, 'কি রে, রান্নাবান্না হয়নি? ঘরে দেখি চাল-তেল-নুন তরি-তরকারি কিছুই নেই। এই লে, শিলিপ

লিয়ে যা মুদি-খানায়। লিয়ে আয় বাজার করে। আর, তুই গেরস্ত বৌ, ভাতার-পুতকে রান্না করে না দিলে চলবে কেনে? যা, আখা ধরা।'

মদের পর আবার ভাত-ডালের ব্যবস্থা করে দেয় ধনপতি।

ধরে তো ধনপত, করে তো ধনপত। আঁচায়-বাঁচায় ধনপত।

গো-গাড়ির গাড়োয়ানের শুধু এক হুঁকা। গলা ছেড়ে গান গাইছে:

'পরাণের হুঁকা রে

কে রাখিল তোর নাম ডাব্বা রে—'

হঠাৎ মওড়া নিল ধনপতি। হাঁকার দিয়ে উঠল: 'কে যায়? রোকো।'

গাড়োয়ানরা জেনে নিয়েছে, চিনে ফেলেছে। ট্যাঁক থেকে পয়সা বের করলে। টিকিটের ট্যাক্সো নয়—টিকিটের ট্যাক্সো তো অদানে অব্রাহ্মণে যাবে। তার চেয়ে কম-সম করে কিছু গুঁজে দাও ধনপতির হাতে, গাড়ি এখুনি পাশ হয়ে যাবে। তোরাও বাঁচবি আমিও বাঁচব। কারু সাধ্যি নেই আর তোদের পথ আটকায়।

সে দিনের সেই খাণ্ডার-মূর্তি ধনপতি, আজকে একেবারে গোপালের মত ঠাণ্ডা।

কিন্তু পথ আটকালো মণিলাল।

বললে, কেন তোরা ধনপতকে ঘুষ দিবি ?

নইলে পুরোপুরি ট্যাক্সো দিয়ে টিকিট কাটতে হলে আমাদেরই লোকসান।

হোক লোকসান, তবু ঘুষ দিতে পারবিনে। জোর করে চলে আসবি রাস্তা দিয়ে।

তার চেয়ে এ ঢের শাস্তি। নিশ্চিন্ত থাকতে পারলে হুঁকোর টানে বেশি সোয়াদ পাব। ধনপতকে আমরা ঘুষ দিচ্ছি কে বলে ? আমাদের হয়ে ভালোমানুষি করে তারই বখশিশ দিচ্ছি।

কে তোদের ধনপত ?

সেই মন্ত্র এত দিনে ওদেরও শেখা হয়ে গেছে। বললে, 'কাড়ে তো ধনপত, ছাড়ে তো ধনপত, আঁচায়-বাঁচায় ধনপত।'

ভাল গাড়ির টানে পিছের গাড়ি এগিয়ে যায়।



হাড়ি-হাজরা

মাটির কলসির ভেলা বাঁধছে হাড়ি-বউ। লালু হাজবার পরিবার। কুড়োমতি। সাটুয়ের দ'য়ে পাঁইফল তুলতে যাবে।

লালু যাবে শুয়োর চরাতে। আঁতুলের বিলে।

কুড়োমতি ফিরবে দুপুরে আর লালু ফিরবে ঝিকিমিকি বেলায়।

ভিজে ভাত আছে হাঁড়িতে। আর ঝালসানা। তাই খে লে গে।

'ভিজে ভাত খাব না। আজ সদ্দি হোলচে।' লালু হাজরা বলে কথার সুরে মিনতির টান দিয়েঃ 'তুটো গবম ভাত এঁদে আখিস বাড়ি ফিরে। বুললি ?'

'হুঁ, বুইচি—' কুড়োমতি গা কবে না।

'আর শোন্, একটু ত্যাল এনে আখিস। বুকে-পিটে মালিশ করে লোব।'

পানিফল তুলে এনে হাটে গেল কুড়োমতি। বেচা-কেনা সারা করে গেল যজমান বাড়িতে। নিজেব মহালে, পূবের চাকলায়। পোয়াতিদের খোঁজ-খবর নিতে। কার কোন অসুখ-বেসুখ করল, কার পেটে তেলে-জলে মালিশ করতে হবে, কার লাগবে তুকতাক, টোটকা-টাটকি। কার ছলে কাক-চিল বসতে দিচ্ছে না বাড়ির তি-সীমায়।

দেয়োমো করে কুড়োমতি। খালাস করায়।

চেয়ে-চিন্তে গেরস্ত বাড়ি থেকে গরম ভাত নিয়ে এসেছে

কুড়োমতি। কে আবার রাঁধে এখন গতর খাটিয়ে। নিজে দুটো রেঁধে নিতে পারে না? বারো মুলুক চুঁড়ে খায়, ঠাকুর-বাড়ির পথ চেনে না।

দাওয়ায় পা ছড়িয়ে বসে সেই ভাতই এখন লাপুরলুপুর করে খাচ্ছে কুড়োমতি।

লালু হাজরা হাজির

কুড়োমতির থাবা খুব চওড়া। গেরাস বেশ দরাজ। খিদে খুব চনচনে।

'হা টে শালি, আমার ভাত কই?'

কুড়োমতির হাঁড়ি দেখাল। এই তো।

'ও তো ভিজে ভাত। বিয়েন বেলা বুলে গেলাম ভিজে ভাত খাব না, সদ্দি হোলচে। তু গরম ভাত এনে খেছিস, ও কটা আমার লেগে আখলিনে কেনে? তু ভিজে ভাত খেলেই তো পাত্তিস।'

'যদ্দিন ছরৎ তদ্দিন।' কুড়োমতি টাকরার উপর জিভের বাড়ি মেরে টাক-টাক শব্দ করলে। বললে, 'আমার গরম না খেলে চলবে কেনে? আমাকে খেয়ে-মেখে বাঁচতে হবে তো? গুজকার করতে হবে তো?' বলে ছড়া কাটল:

'ভিজ্যা পান্তা ভোক্ষন
ঐ পুরুষের লোক্ষন।
আমি মাগী গরম খায়
পাছে কবে মরে যায়।'

লালু রা কাড়লে না। এক নজরে তাকিয়ে রইল কুড়োর দিকে। রাগে চোখ রাঙা না হয়ে জলে ঝাপসা হয়ে আসে।

কিন্তু কী করবে? কুড়ো তার তৃতীয় পক্ষের সাঙা করা পরিবার।

কিটকিটে কালো নয়, কুচকুচে কালো। দেখলেই চোখ জুড়িয়ে যায়, গায়ে ঠাণ্ডা বাওরের ছোঁয়া লাগে। অমানিশিব অন্ধকারের মত অটুট। যেন কষ্টি পাথরের শান-বাঁধানো চাতল। আর সেই শানের মতই তার নিষ্ঠুরতা।

বড় রোগাটে-পাঁকাটে দেখতে লালচাঁদকে। ডিগডিগে। বউর লাটদারিতে বেঁচে আছে কোনো রকম। নইলে শুয়োর চরিয়ে কত আর সে কামাতে পারে? শুয়োর যদি সে ভাগে পেত, পেত যদি বাচ্চার ভাগ, তা হলেও বা কথা ছিল। সে পরের শুয়োর চরিয়ে রাখালি-বাগালির মাইনে পায়। আসল যা রোজগার সব কুড়োর কেরামতিতে। তাই নিন্নু হয়ে আছে সে বউয়ের। ঢাকের বেঁয়ো হয়ে—সানাইয়ের পোঁ।

তাই বলে ছুটি গরম ভাত রেঁধে দেবে না? নরম বলে ধরম দেখাবে?

'যাগগে—টুকচে ত্যাল তো দে। বিলের জলে খালুস লেগেছে, গায়ে-পায়ে মাখি।'

কুড়ো ভাত-মাখা আঙুল চাটছে আঁকিয়ে-বাঁকিয়ে। বললে, 'পয়সা নাই।' পরে ঘটি কাৎ করে জল খেয়ে বললে, 'যা আক্কারা ত্যাল—আজ আর ত্যাল আনব না।'

'হা টে শালি বিটি, তবে কি আর মাচ-তরকারি আদবিনে? ত্যাল না দিয়ে মাচ-তরকারি আঁদবি কি দিয়ে টে?'

কুড়ো ঝাঁকরে উঠল: 'হা খালভরা! বাঁশচাপা! আজ তিন দিন হল সইষ্যা বাটা দিয়ে তরকারি হোচে। তু কানা দেখতে পেছিস না? পিণ্ডি যে খেছিস, কই, কোনো কতা বলিসনি যে?'

'শুতু সইষ্যা বাটা দিয়ে মাচ-তরকারি আঁদনা হয়? ত্যাল লাগে না?'

'হা নামুনে! জকা! সষ্যার মত্তেই তো ত্যাল— আবার ত্যাল লাগবে কিসে? নে, ডালার মত্তে সইষ্যা আছে, তাই বেটে নিয়ে তোর খালুসে লাগা গা।'

লালু হাজরা তাই মেনে নিল ঘাড় পেতে। বেখাপ্পা-বদরাগীর মত কোনই কাণ্ড করলে না। যেন সেই শক্তিই তার নেই।

ভদ্দর-শদ্দরের থেকে শুরু করে পাড়ার পঞ্চজনে সবাই তাকে জানে উদোমাদা ব'লে। বলে, ল্যালা, আঁবাও। মাগবোশো।

লালু বলে, 'মা লয় যে খেদ্‌রে দেবো, বাপ লয় যে তাড়পে দেবো—রর্ধ-রঙ্গে কি বুলছি বলুন?'

কুড়োমতি ছাড়া আর তার কে আছে?

কিন্তু কল্লা মাগী মধ্যে-মাঝে পেচণ্ড পেহার দিয়ে বসে।

তখন ভালোমানুষি করতে আসে কেউ-কেউ। কুড়োমতিকে বলে, 'মন না বসে ছেড়ে দিলেই তো পারিস এই অনা-মুকোকে? আঁশ খেয়ে ওববার লষ্ট করিস কেনে? এখনো তোর দলমলে দেহ—কত ভালো-ভালো—'

কুড়োমতি লজ্জার লহর তুলে হাসে। বলে, 'ওল-কচু মান সবই সমান। আমার কাছে অঙ-অঙ্গের গপ্প বুলতে এসো না।' বলেছড়া কাটে:

'যদি কেষ্ট পিতি থাকে মন
তবে কোথা লাগে তার আইন-কানন।'

মদন চাপরাশির মেয়ের ব্যথা উঠেছে। 'পেরথম' পোয়াতি। এসেছে শ্বশুরবাড়ি থেকে। গঙ্গাটিকুরিতে শ্বশুরবাড়ি। কাটোয়ায় তার সোয়ামী ফৌজদারিতে মুহুরিগিরি করে। এক ইষ্টিশান পরেই কাটোয়া।

কুড়োমতির ডাক পড়ল।

'এখানে কেন মরতে এলাম মা?' মদন চাপরাশির মেয়ে পূর্ণশশী যন্ত্রণায় আর্তনাদ করছে: 'কাটোয়া ছেড়ে কেনে এলাম এই জঙ্গল-আগাছার দেশে? এখানে আমাকে কে বাঁচাবে?'

কিছু ভয় নেই মা, আমি আছি। সুপেসব করিয়ে দেব।

জমিদারের যেমন জমিদারি, গেরস্তর যেমন জোত-জমা,

গুরু-পুরুতের যেমন শিষ্য-যজমান, আমাদের তেমনি পো-পোয়াতি। সমান কদর। হাত আমাদের রপ্ত-দোরস্ত, কিছু ভয়-ডর নেই।

এবার খানিক হাঁটো দেখি আঙনায়।

'রক্ষে করো দাই-মা, আমি মরে যাব।' পূর্ণশশী কুড়োমতির হাত ছুটো আকুলি-বিকুলি করে জড়িয়ে ধরে।

'যাঁহা মুস্কিল তাঁহাই আসান। দেবতা-গোঁসাইকে মানত কর দিনি, এখুনি ছেলের মুখ দেখবে।'

'একটু জল দাও—'বড় ব্যথা খাচ্ছে মেয়েটা।

জল ঢেলে দিয়ে জায়গাটা মাটিতে নামিয়ে রেখেই কুড়োমতি হঠাৎ হাঁক দিয়ে উঠল: 'ওগো ভালো-মন্দ কুজ্ঞানী নোক যদি কেউ থাকো তো সরে যাও। মাথার চুলের গিঁট খুলে দাও শিগ্‌গির।'

পাড়ার অনেক ঝিউড়ি-বউড়িই এসে জড় হয়েছে মজা দেখতে।

'হেই মা, এখানে আবার কুজ্ঞানী ভালো-মন্দ কে আছে গো। ইয়ে আবার কী কতা?'

'এই লাও ভাই, মাথার চুল খুললাম। সবাই খোলো।'

লাটপাট করে বাঁধা চলকো খোঁপা সবাই ঝুপঝাপ খুলে ফেলতে লাগল।

'ওগো একখানা ক্যাদা কি অস্ত্র হেত্যার দাও দিনি

শিগগির। ঘরের কোন ধারের চাল লাগাল পাব বলো তো ?'

হেতের নিয়ে এল মদনের বউ টুনুবালা।

হেতের দিয়ে ঘরের চালের তিনটি বাঁধন ফট-ফট করে কেটে ফেলল কুড়োমতি। কিন্তু কই, এখুনো তো কিছু আসান হল না।

এ যেন বাপু কেমন-কেমন লাগছে। পাঁচ জনকে ডেকে দেখাও। মজলিশ কর। দশে মিলে করি কাজ, ভোগুল হলে নাই লাজ।

সকলে সল্লা-সুলুক করতে বসল। পরস্পব চোখ-টেপাটেপি আর ঘন-ঘন ঘাড়-মাথা নাড়া। কী বিঘটন না হয়ে বসে !

'তু কেমন বুঝছিস হাড়িবৌ ?' টুনুবালা অস্থির হয়ে উঠল।

'তাই তো বাপু, দিন নাই দুপুর নাই, সোমবার নাই মঙ্গলবার নাই, কবে কোন আমাবস্যা পুন্নিমেতে কোতু থুতু ফেলেছে বা কখুনু গা উদোম করে বসেছে। কি করতে কি হোলচে ঠেকনা নাই।'

'ওমা, কি হবে গো ? কুদিষ্টি পড়েছে গো।' টুনুবালা হাঁকিয়ে-চেঁচিয়ে উঠল ঃ 'ওঝা ডাকো, ওঝা ডাকো।'

পূর্ণশশী আর কাউকে চেনে না—জানে না। সে শুধু কুড়োমতির কাছে মিনতি করে। বলে, 'পেটেরটাকে মেরে ফেল, আমাকে বাঁচাও।'

৩

'শিগগির করে স' পাঁচ আনা পয়সা আর ছোটপানা কুলের ডাল আনো—ধান থাকে তো পাঁচ পোয়া ধান—' কুড়োমতি ধুমুল দিয়ে উঠল: 'রাখো ঐ বাঁহাতি আমার পেছেতে।'

শেষকালে বেপদ কিছু হয়ে বসে, একেবারে না খালি হাতে ফিরতে হয়।

টুনুবালা ধান আর পয়সা নিয়ে এল। কুলের ডাল ভেঙে আনবে কে?

'হোলছে, আর দেরি নাই। জয় মা কালীর দোয়া, জয় মা হরির দোয়া—আমার মুখ এখো মা।'

ছেলে হয়েছে পূর্ণশশীর। ব্যাটা ছেলে। সন্নবন্ন ছেলে। হয়েই ট্যাঁটাতে শুরু করেছে। বুঝলে না, খাওয়ার জন্যে কাঁদি।

সুতো কই, চোঁচ কই? বাঁধন-কাটন হবে। মধু দাও, গোলমরিচের গুঁড়ো দাও। ছেলের মুখে দেব।

'কাল্-দমনের দলে যাবা, ত্যাল মাখবা আবাথাবা, আর খাল দেখে পাত পাড়বা—'ছেলের ধোয়া-পাখলা করতে-করতে কুড়োমতি আদর করে ছড়া কাটে।

শেষে ছেলেকে পূর্ণশশীর কোলে দেয়। বলে, 'ছেলে তোমার না আমার?'

পূর্ণশশী খুশিতে গদ-গদ হয়ে বলে, 'ছেলে আমার।'

'ওগো ছেলে-পোয়াতি সব এক পাশ। আমি বাইরে যাব—'

বাতাস লাগলে বিঘ্ন হতে পারে। তাই আবার ফেরবার সময় আগুন ছুঁয়ে ঘরে ঢোকে।

তুটি সরষেতে মন্তর পড়ে পূর্ণশশীর কাপড়ে বেঁধে দেয়। একটু মাছধরা জাল-ছেঁড়া ঘরের 'ছামু'তে ঝুলিয়ে রাখে। ছোট মই এনে পেতে রাখে চৌকাঠের নীচে। যাতে ভূত-পেরেত আঁতুড়ঘরে দৃষ্টি না করে।

পাকা কলা খাওয়ায়। শুঁঠ পেঁপুল গোলমরিচ বাটা ঘি দিয়ে ছোঁক দেয়। আরগোজার পাতা জোগাড় করে আনে। তার রস করে। যাতে তুধ বাড়ে, কালজিরে বাটা চাল-ভিজে খাওয়ায়। তিন দিনের দিন ভাত দেয়। কত যত্ন-আত্মি করে। সব তুমি হাড়ি-মা, দাই-মা। তুমিই আমার ভাবীসাবী, জাতজ্ঞাত। তোমাকে ছাড়া চলবে না আমার তু'দণ্ড।

রাত্রে মা-ছেলের পাশে তালাইর উপর ঘুমিয়ে থাকে কুড়োমতি।

বিদেয়-আদায় ভালো হবে লিচ্চয়। ঘরে থাকবার রীতকরণ নয় তাদের। কিন্তু পূর্ণশশী ছাড়ে না। বলে, 'আঁতুড়-ষষ্ঠীর পর যাবে। আর যদি এর মধ্যে ডাক আসে কোনো, ছুটি দেব।'

ছ'দিনের দিন রাতে আঁতুড়ষষ্ঠীর পূজো হয়। দেয়ালে গোবরের গোটা লাগায়, তার গায়ে কড়ি বসায় নটা। নটা পাতাশুদ্ধু কঞ্চির মাথা গুঁজে দেয় তাতে। তার উপর

হলদে ন্যাকড়ার আচ্ছাদন দিয়ে সিঁদুরের টোপা দেয়। নৈবিদ্যি দেয় মুড়ি-মুড়কি চিড়েভাজা কড়াইভাজা। সে পূজোর পুরোত আমাদের কুড়োমতি।

ছেলেকে মাটিতে শুইয়ে রাখে। তালপাতে অ আ ক খ লিখে রাখে ষষ্ঠীর সামনে, রাখে দোয়াত-কলম। ষষ্ঠী ও ছেলের দিকে বৈমুখ হয়ে বসে থাকে পূর্ণশশী আর কুড়োমতি।

ছেলে কেঁদে উঠলে তখন কোলে নেয়।

বিধেতার লিপি লেখা হয়ে যায় ছেলের কপালে।

'এবারে আমি যাই। ঘরের পুরুষ উগুটে, শরীলে আরো বেজুত ধরে যাবে।'

আর দুটো দিন। গাছ-ষষ্ঠীর পূজো হবে বিজোড় দিনে বটগাছ, শেওড়া গাছ বা পাকুড় গাছের গোড়া।

গাছ-ষষ্ঠীরও পূজো হয়ে গেল। পাটকাম সব কুড়োমতিই করলে।

বললে, 'এবার ঘরকে যেছি আমি ঠিক। আবার তোমার শুদ্ধ হবার দিন আসব। সি দিন আমার পাওনা-গণ্ডাটা—' ছেলেকেও একটু আদর করলে। বললে, 'ই ছেলের যখুন বিয়ে হবে তখুন আবার আমার ডাক পড়বে। ই আমার খালাসী ছেলে।'

কুড়োমতি চলে যায়। এবার ঘরে আসে অগ্নি-মা।

একুশ দিনের দিন পাকাপাকি শুদ্ধ হয় পূর্ণশশী।

গোয়ালে বসে মাথায় দুধ আর গঙ্গাজল ঢালে। তারপর ডুব দেয় বাড়ির গোড়েতে।

ঘুসঘুসে জ্বরে ধরেছে পূর্ণশশীকে। লিকলিকে হয়ে গিয়েছে চেহারা। তা হোক, আজকের দিনে একটা ডুব না দিয়ে উঠলে তার উপায় নেই।

সেরে যাবে অসুখ। এমন ছেলে যার কোলে, তার আবার আধিব্যাধি কি! সুখের ঘরে রূপের বাসা!

কুড়োমতি এসে দাঁড়ায়। তার পাওনা-থোওনাটা বাকি আছে এখনো। ছেলের বাপ ঘুরে যেয়েছে? কী দিয়ে দেখলে সোনামুখ?

গেরস্ত বাড়ি, ধান-খড়ের কারবার, উঠোনে কুটি-কুটি খড় পড়ে আছে। পূর্ণশশীর কাছ পর্যন্ত নেতাড় লেগে আছে। পূর্ণশশীর মনে হল হাড়ি-বৌর ছোঁয়া খড়ের সঙ্গে সঙ্গে নেতাড় হয়ে গেল। আঁৎকে চেঁচিয়ে উঠল সে: 'এই যা, সব মাটি করল মাগী! কি লো ছুঁয়ে দিলি?'

কুড়োমতি থ বনে গেল। সে দাঁড়িয়ে আছে প্রায় কাঠা দুয়েক দূরে, ছুঁলো কখন?

'তোকে আগেই বারুন করলাম, আগিয়ে আসিসনে, আসিসনে, ছোঁয়া লাগবে, নেতাড় ছেড়ে দে। তা কানের মাথা খেয়েছিস নাকি মাগী? এখন যে তোর ছোঁয়া এসে গায়ে লাগল।'

কুড়োমতির মুখে রাকাড় নেই।

'আমি গোয়ালঘরে গিয়ে চান করে এসে শুদ্ধ হলাম। পোড়ামুখি মাগী, তু আসবার আর সময় পেলিনে? এলি তো এলি, সরাসর ছুঁয়ে দিলি? আমি কি এখনো সেই আঁতুড়ঘরের পোয়াতি আছি?'

কি, কি, হল কি? টুনুবালা ছুটে এল।

'আ মর মাগী, তোর জ্ঞান নাই? তু হাড়ির মেয়ে, অচল-অজল, তোর আস্পদ্দা তো ভেষণ। বাড়িময় কুটি-কুটি খড় পড়ে আছে, তুই কি কানা, দেখতে পাস না? খড়ের নেতাড়ে তুই ছেলে-পোয়াতি ছুঁলি কোন হিসেবে? আমরা বামুন না হলেও তোর চেয়ে তো বড় জাত বটি। তোর এই খিটকেলের কি কম্মটা ছিল? কেন আবার তুই কাঁচা পোয়াতিকে চান করাবি শুনি?'

কুড়োমতি আঁট হয়ে দাঁড়াল। বললে, 'হা গো, আমি তো উদিকে ছুঁইনি-লাড়িনি—কেন মিছিমিছি লপলপ করছ?'

'হারামজাদি, নেতাড় দেখতে পাস না?' মুখিয়ে উঠল টুনুবালা: 'নেতাড় ছাড়লিনে কেন?'

'বাড়িতে গোটা উঠোনেই তো খ্যাড়ের কুটি পড়ে আছে। এতে যদি দোষ হয় তাহলে তো ঘাসের সঙ্গেও নেতাড় লেগে আছে। ঘাসে-ঘাসে নেতাড় লেগেও তো ছোঁয়া যেতে পারে ত্রিভুবন।'

'ল্যায় করবি তো মুখ ভেঙে দেব।'

'তা ছাড়া আমিও সেই মানুষ, ছেলে-পোয়াতিও সেই মানুষ। আঁতুড়ঘরে এক বিছানায় গলা ধরে শুয়েছিলুম। ভাত-জল হাতে করে আগিয়ে দিয়েছি, তা খেয়েছ, কত নোংরা ঘুচিয়েছি, কত লাড়া-ছোঁয়া করেছি—মা-বুন বলে গিদের করেছ! আর এখন দাই-উদ্ধার হয়ে গেলে পরে পয়জার মারছ। নায়ে হতে নামলে পরে নাউরে বেটা শালা, তাই না?'

'চুপ কর মাগী। যা করলি তা করলি, তা-পর আবার গজল্লা কিসের? ছোটলোকের আবার অত খ্যাঁক-খ্যাঁক কেন? কুঁজোর সাধ যায় চিৎ হয়ে শুতে—না? আতুড়ঘরে না হয় খেয়েছে-ছুঁয়েছে—বেকচ্চায় পড়ে হাতি, চামচিকেতে মারে লাথি—তাই বলে কি শুদ্ধ হয়েও তোকে ছুঁতে হবে?'

'যখন যেমন তখন তেমন।' ফোড়ন কাটে পূর্ণশশী। 'ঘরের ভিতর যদি কেউ কোনো ল্যায়-অল্যায় করে তাতে দোষ হয়? তা বলে লোক দেখিয়ে তোকে ছুঁতে হবে?'

'যাও, যাও, আর লাথি উচিও না। সব জানা আছে। ঢাকে ঢোলে বিয়ে কাসতে মানা। কত গেরস্তর মেয়েকে কত ভাবে আমরা বাঁচিয়ে দি—দরকার হলে নিজের বাড়িতে লিয়ে গিয়ে এখে দি, নিজের হেঁনসেলে নিজের হাতে ভাত আঁদনা করে খেতে দি—তখুন তো সব চলে। ঠ্যালায় পড়ে ল্যালার জল খেতে আপত্য নাই, না?'

'মুচলমানী হারামজাদী, ঝাঁটা মেরে গায়ের ছাল ছাড়িয়ে দেব—' টুনুবালা শতমুখী নিয়ে বেরিয়ে এল। 'বেরো তু আমার চোহিদ্দি থেকে।'

অনেকক্ষণ কাঁদল কুড়োমতি। কেন কাঁদল কে জানে। এত তেজ-তাপ যার, এত যার জোরজার, সে এত সহজেই হার মানলে। কেঁদে মাটি ভেজাতে বসল।

মনে তার বড় ব্যথা লেগেছে।

তাই বলে চোখের জলে ভাসবে না কখনো পিথিমি। আগুন লাগাতে হবে।

চোখের জল ফেলে তাই সে নিবতে দেবে না আখার আগুন।

বাড়ি ফিরে কুড়োমতি ভাত রাঁধতে বসল। হাজরা শুয়োর চরিয়ে এখনো বাড়ি ফেরেনি। সামনের খাল থেকে কুড়োমতি ধরতে গেল কটা গেঁড়িগুগলি।

লালু যখন বাড়ি ফিরল আখার উপর ভাত ফুটছে টগবগ করে। শিলে পোড়া গুগলি বাটছে কুড়োমতি। খাওয়ার আজকে খুব তেজ হবে তা হলে। লালুর জিভ সড়সড় করে উঠল।

'ইয়ের পিতিফল চাই। তুই যদি আমার স্বামী হোস তবে ইয়ের তুর পিতিকার করতে হবে।'

লালু থমকে দাঁড়াল।

'তু সাতাসে, না, দশ মাসেই হয়েছিস? মানুষ বটিস? ভাত খাস? না শুদু পাটের শাগের বীচ খাস?'

'কি হয়েছে তুর?'

'আজ গেরস্ত বাড়িতে বড় রপমান হোলচে, ই রপমান সইতে লারব। আর ইস্তিলোকের বাড়ি যাবনা কখুনু দেয়োমো করতে। খ্যাড়ের নেতাড়ে পা দিয়েছিলাম বলে ছোঁয়া লেগে অশুদ্ধ হোলছে ঘরগুষ্টি। আঁতুড়ঘরে আমার লাড়া-ছোঁয়া জলটল সবই চলেছে—এখন দায়-উদ্ধার হয়ে ছিঁএে ছাঁটলেই দোষ—'

লালু হাজরা মাথা চুলকোতে লাগল।

'আমাকে ঝ্যাঁটা দেখালে। তু যদি আমার স্বামী হোস, তুর কাছে আমি মিনুতি করছি—ইয়ের তু বিহিত কর। যাকে ভাতারে করে হেলা তাকে রাখালে মারে ঢেলা। বিয়োলোই হই, শাঙালোই হই, আমিই তোর তি, তু ছাড়া আমার আছে কে?'

লালু হতভোম্মের মত তাকিয়ে রইল। কুড়োমতি তার কাছেই মিনতি করছে, ভিক্ষে চাইছে। তার স্বামীত্বের কাছে আশ্রয় চাচ্ছে। হিয়ের তাপ জানাচ্ছে তার কাছে। বলছে, পিতিবিধেন করো। সে এত বলবান, এত শক্তিধর!

'এবার থেকে তোকে আমি গরম ভাত এঁদে দেব। এখন গুগলিসানা দিয়ে টুবোজ্বলন্ত ভাত খেয়ে নে—শরীরে তুই একবার বল বাঁধ। লাঠি হাতে নে। গলায় রজ দে। বলে

আমরা নাকিনি কেউ লয়, আমরা ছোট জাত, আমাদের সব ইতুরে কাণ্ড। কী জানে উয়ারা? আমরা কি মান্যের লোক কম ছিলাম রে একদিন?'

কুড়োমতি কোমরে আঁচল জড়াল।

'আমরা হাজরার গুষ্টি। হাজার হাজার লড়িয়ের সর্দারি করেই না আমরা হাজরা! এক লাঠি ধরে হাজার লোককে থ বানিয়ে দিয়েছি আমরা। লাঠির জোরে লুটপাট করে দেশটা একদিন হাত করেছিলাম আমরা—মনে নাই?'

লালুর বুকের ভিতরটা খলবলিয়ে উঠতে লাগল। যেন মনে পড়ল সব।

'রনগাঁর কুঠিতে ডাকাতি করে বেরুবার সময় আমার কত্তাবাবার বাবার পায়ে চাঁদগজাল ঢোকে, সেই গজাল পায়েই বামাল কাঁধে করে ঘটায় চার কোশ পথ অক্লেশে চলে আসে। তার গাঙাড়ি শুনলে পাহাড়ে ফাট ধরত, গর্ভিনীর গর্ভপাত হত—আমরা সেই হাজরার ঝাড়। হৈ-হয় ক্ষত্রিয় আমরা। আমরা কি কম? ফতা হাড়ির জাতজ্ঞাত আমরা—যে ফতে সিঙ্গির পরগনা ইটা সেই ফতে সিং। কেল্লা ফতে, কাম ফতে থেকে ফতে সিং। তু শুনিসনে কিছু? মুণ্ডমালার বাঁধ দিল-ছিলাম আমরা! সব যেয়েছে আমাদের, আজ্যি-আজ্য কিছু নাই, তমু হাজরা নাম ঠিক আছে। সেই হাজরার বেটা তু। তোকে কে উখতে পারে ভিমগুলে?'

লালু ভিতরে-ভিতরে কাঁপতে লাগল থর-থর করে।

'তোর গায়ে কি সান নাই? তুই কি অক্ষাম-অজ্ঞান?'

হঠাৎ বার কতক মুখে 'আবা' দিয়ে বিকট আওয়াজ ছাড়ল লালচাঁদ। বাঘের মত গুমগুমে হাঁকার। সমস্ত শরীরে তার গিঁট পাকিয়ে উঠল। শুয়োরের কুচির মত মাথার চুল খাড়া হয়ে উঠল। বাই ঠুকে লাফ দিয়ে হাতের খেঁটে ঘোরাতে লাগল বনবন করে।

গামলাতে গরম ভাত বাড়তে লাগল কুড়োমতি।

বৈরাগ্যদের বাড়ি থেকে পোয়াতি-খালাসের ডাক এসেছে।

'না, না, যাবনা আমরা আব ভদ্দর-শদ্দরের বাড়িতে।' লালু গর্জন কবে উঠল: 'আমরা লড়াইয়ে যাব। শোন নাই সাহেবডাঙায় যোদ্ধ নেগেছে। আমরা আর উ ছোট কাজ কবে ছোট নোক থাকব না। আমরা যোদ্ধ করব।'

ঘটির জলে হাত ধুয়ে আচলে মুছতে মুছতে কুড়োমতি বললে, 'না, যাই, বেপদ উদ্ধার করে দিয়ে আসি। ই বেপদে আমি না গেলে যাবে কে? ই বেপদের কথা শুনলে থিব থাকা যায় না যে। তা বাপু, পাওনা-গণ্ডা আগাম লিয়ে লোব কিন্তুক। উই যে কথায় বলে:

অভদ্দর বর্ষাকাল
হরিণ চাটে বাঘার গাল
ওরে হরিণ তোরে কই
সময় কেরমে সকলি সই।

আমাদের হোলছে সে দশা। বাঁ হাত কাটতেও যে দুখ ডান হাত কাটতেও সেই দুখ।'

পরে লালচাঁদের দিকে তাকিয়ে বললে, 'তু খেয়ে লে। আমি এক ঘুরনা দিয়ে আলছি এখুনি।'

ভাম হয়ে বসে রইল লালচাঁদ।

গরম ভাত জুড়িয়ে যাচ্ছে। কালা হয়ে যাচ্ছে। এখনো খেয়ে নিলে পারে লালচাঁদ। এখনো তার রক্ত গরম আছে। এখনো তার গাঙাড়ির কাঁপুনি তড়পাচ্ছে আকাশে। আর বেশি দেরি করলে তার দেহও জুড়িয়ে যাবে ক্রমে ক্রমে, বল-বিক্রম নরম হয়ে পড়বে। যুদ্ধে যাবার স্বপ্ন যাবে মিলিয়ে। মুণ্ডুমালা দিয়ে বাঁধ দেবার স্বপ্ন।

নিসেধোর মত বাড়া ভাতের দিকে তাকিয়ে রইল লালচাঁদ।

না, কুড়োমতি ফিরে আসুক।



[illegible]

সব যাক, কিন্তু নামটুকু যেন না যায়। দেবতাগোঁসাইর কাছে কত মিনতি করেছে, বিমুখ হয়ো না বাবা। অভাবে-অসদ্ভাবে থাকি, থাকব, কিন্তু নামটুকু যেন বজায় থাকে। গা'য়ে-বাছুরে সুখ থাকলে বনে গিয়ে দুধ দেয়। যদি নামটুকু থাকে, হাতটুকু থাকে, তবে পয়সায় টানা পড়বে না কোনো দিন। হেই বাবা রুদ্দ্‌দেব!

চোরের উপর রাগ করে ভুঁয়ে ভাত খেয়েছে আজ ভোলানাথ। রোজগারের পয়সা দিয়ে কাঁচি মদ কিনে খেয়েছে। থমথমে পায়ে বাড়ি ফিরেছে সনজেবেলা। নিঝ্‌ঝুমের মত।

নিশ্চয়ই দেখতে পাবে গোরাশশী ঘরে নেই। ঘরে তালা লাগিয়ে আঁচলে চাবি ঝুলিয়ে গেছে নিশ্চয়ই পাড়া বেড়াতে। বা, কারু ঘরে রসবিলাসের গল্প করতে। ঢুলন করতে।

এমন সময় ফেরবার কথা নয় ভোলানাথের। এবারে, এত দিনে, ঠিক ধরে ফেলবে কোরকাপ।

আর যদি একবার ধরে ফেলতে পারে—ভোলানাথের চোখ দুটো ঘুরন দিয়ে উঠল। গায়ে এল যেন বুনো দাঁতালের গোঁ।

যা ভেবেছিল। গোরাশশী ঘরে নেই। দরজা হাট করা।

কাঁথা মুড়ি দিয়ে ছেলেটা ঘুমুচ্ছে অবেলায়। বোধ হয় জ্বর এয়েছে। আর সেই ফাঁকে—

'বাড়ি থেকে একবার বার হলে ঘরকে ফিরতে আর মনে সরে না, লয় ?'

গোরাশশীর কান বড় খর। কাঁধ থেকে ঢোল নামিয়ে রাখতেই শব্দ পেয়েছে। ঘাটে গিয়েছিল সে বাসন মাজতে। ফিরতে তার এক পলক দেরি হল না।

'ফিরতে রাত হবে কথা ছিল। কিন্তুক—' ভোলানাথের গলাটা কেমন ধরে এল। রাগ-বিরাগের ছোপ চলে গিয়ে মনে লাগল মন-খারাপের ছোঁয়া। বললে, 'আমি বাড়িতে না থাকলে তুর বেশ মজাই হয়, লয় বৌ ?'

'ক্যানে ?'

'আমি না থাকলে ইদিক-সিদিক করতে পারিস আধেক খানেক—'

'ক্যানে ? আমার মন থাকলে তু কি বাড়িতে বসে আগলাতে পারিস ? তুইই তো মাঠে-ঘাটে শহরে-বাজারে ঘুরে বেড়াস, কুথা কুন কীত্তিকম্ম করিস তা কে জানে ?'

না, ঝগড়া করবে না ভোলানাথ। গোরাশশী তার বুড়ো বয়সের সাঙা-করা পরিবার। রঙে-রসে ডগমগ যোবতী মেয়ে। যোবতী মেয়ে বলেই সন্দ করতে হবে না কি ? ভোলানাথেরই মন ছোট, ছোঁচপড়া। 'কুকুর যদি রাজা হয় বসে সিংহাসনে, তল-চোখে তল-চোখে তাকায় ছেঁড়া জুতার পানে।'

ফতুয়ার পকেট থেকে বিড়ি-দেশলাই বার করে ধরালে

দাঁতে চেপে। ঢোল নিয়ে বসল। চাঁটি দিয়ে দেখতে লাগল বারে বারে। কোথায় কী বেকল হয়েছে। চামড়ার দলগুলিতে কি টান নেই? আওয়াজ কি জুড়িয়ে গেছে? হাতে আর সেই ফুর্তি ফোটে না?

'সি কি? সাত আজ্যি ঘুরে এসে আবার ই ঢোল নিয়ে বসেছিস? গয়ার পাপ! বলি খাবি নে?' গোরাশশী ঝংকার দিয়ে উঠল।

'যদি দিস তো খাই। পেচণ্ড খিদে পেছে।' কিন্তু তার কোনোই প্রমাণ পাওয়া গেল না। চোখ বুজে চাঁটি মেরে কেবল বোল পরখ করছে। চোখ মেলে পরখ করছে আঙুলের গিঁটে-গিঁটে কিসের এ দুর্বলতা?

'খিদে পেছে তো পয়সা-টাকা দে। ঘরে চাল নেই। তুলসীর ঠেঁয়ে কিছু কিনে আনি গে।'

'সেই ফাঁকে একটু—'

'তোর রঙ্গ থো। গায়ে জ্বলুনি ধরে আমার। দে কি দিবি।'

পকেট থেকে সামান্য কিছু রেজকি বের করল ভোলানাথ।

'অনেক ওজকার করেছিস তো? এবার আর রূপদস্তার চুড়ি লোব না, সোনার ভাটিয়া চুড়ি চাই। বুললি?'

ঠাট্টার খোঁচাটা বুকের মধ্যে এসে ঠিক লাগল। ভোলানাথ বিড়িতে টান দিতে গিয়ে দেখল নিবে গিয়েছে। বললে, 'এবার ওজকার হয়নি। যাও হয়েছিল মদে ঠুকে দিয়েছি।'

'বেশ করেছিস। ই রকম বেশি ঠুকতে গেলেই মাথামুড় নেপাট হয়ে যাবে।'

স্তি-লোক শুধু রোজগারই বোঝে। বোঝে শুধু সাধ-আমোদ। বোঝে কি করে একটু ডঙ্কা মেরে বেড়াবে।

আরে, টাকাই যদি সব, তবে ঢোল ফেলে দিয়ে লাঙল তুলে নিলেই তো হয়! বলি, মান-খাতিরটা কি কিছু নয় দুনিয়ায়? শুধু টাকা হলেই কি মন ওঠে? পেট ভরলে কি বুক ভরে? দশটা গাঁয়ের লোক যবে সুখ্যাত করে, তার দাম কি টাকায় ধরা যায়?

কিন্তু কেন এমন হল?

'জানিস বৌ, আজ আমি হেরে গেইছি।' ভোলানাথ আর নিজেকে ধরে রাখতে পারল না। ভেঙে পড়ল।

'কি হেরে গেইছিস? মামলা ছিল না কি কোর্টে? কই বলিসনি তো?'

'মামলা নয়, ঢোলের বাজনায় হেরে গেইছি।'

গোরাশশী হেসে উঠল ছল্‌কে-ছল্‌কে। বললে, 'ঢোল! ওটাতে তো বাজালেই শব্দ হয়, ওটার বাজনায় আবার বাহাদুরি কি! বলি, হাললি কার কাছে?'

'পাল্লাদার জুটেছে—ই ময়ুরপুর গাঁয়ের বাজিয়ে। নাম তারাপদ বায়েন। হাত বড় মিষ্টি রে, বাজানোর ঢংও বলেহারি। মাইরি, হেরে গেলাম উর কাছে। সবাই বললে হেরে গেলাম।' ভোলানাথ কাতর চোখে তাকাল স্ত্রীর দিকে।

গোরাশশীর সেই হাসি এখনো সরে যায়নি চোখের থেকে। আবার তাতে ঝিলিক পড়ল। বললে, 'ঢোলের আবার হারজিং কি। মামলা-টামলা হয়, লড়াই-যুদ্ধ হয়, বুঝি। তুইও বাজাবি ঢোল উ-ও বাজাবে ঢোল—তুজনের বাজনাতেই কানে তালা লাগবে—তুজনেই সমান ওস্তাদ। চোখ-খেগোদের বিচেরকে বলেহারি।'

গোরাশশী বুঝবে না তার অন্তরের দগ্ধানি।

কিন্তু কেন বুঝবে না ?

'এমন তো লয় যে বায়নার টাকা কম দেছে। মদ খেয়ে উড়িয়েছিস, তা ঢোলের দোষ কি।' গোরাশশী আবার অন্তরটিপনি ঝাড়লে।

টাকা হলেই যে সব হয় না এ মোটা কথাটা গোরাশশী বোঝে না কেন ? রূপ হলে কী হয় যদি অন্তরে না রঙ থাকে ?

তারাপদ কত বাহবা পেল সভায়। মালা পেল। ইনাম-বকশিশ পেল। লোকে কত গুণ গাইলে। ভোলানাথের দিকে কেউ দেখেও দেখলে না।

'লে, থো এবার। ভাত আঁদা আছে, খাবি চ।'

গ্রাহ্য করে না ভোলানাথ। কেন এমন হল, বারে-বারে চাঁটি মারে ঢোলে। আঙুলে জং ধরে গিয়েছে। ভোমরার পাখার মত নাচে না আর।

না, সকাল-সনজে রোজ মহড়া দিতে হবে। ঐ মতিভ্রষ্ট স্ত্রীর কথায় কান দেয়া নয়।

'রাত-দিন ঠকর-ঠকর আর ভাল লাগে না।' একেক দিন জোর-গলায় নালিশ করেছে গোরাশশী।

'ঠকর-ঠকর না হলে হপর-হপর খ্যাবা চলবে কি দিয়ে?'

'তার চেয়ে কিষেন-মান্দেরি করলে লক্ষীর পাঁজ পড়ত সংসারে।'

কৃষেন-মান্দেরির আবার নাম কি! মযোদা কোথায়? কিন্তু ঢুলীর নামে দিশ-বিদিশ আমোদ হয়। রাজ্যে ঢোল পড়ে যায়। দেশ-ঘাট থেকে কত লোক দেখতে আসে। মেলা-খেলায় কত লোক ঘাড়-মাথা নেড়ে-নেড়ে তারিফ করে। শিগগির আর তেহাই পড়তে চায় না। এ সবের দাম কি টাকায় হয়? টাকা দিয়ে কি অন্তরের সন্তোষ কেনা যায়?

গোরাশশীর ব্যাভারে ভোলানাথের বুকের মধ্যিটা গুরগুর করতে থাকে। মন মাতিয়ে ঘর-সংসার করতে সাধ যায় না। ইচ্ছে হয় কোন দিকে চলে যাই। যে স্ত্রী স্বামীর মনের দুখ-শোক বোঝে না তার সঙ্গে কি মন বসে?

অথচ যৌবনে দলমল করেছে গোরাশশী। করুক। দোলন-হেলন ঠমক-চমকে তার কী হবে যদি না পায় মনের প্রণয়!

সত্যি, গুরগুরিয়ে বাজে না আর ঢোল। নিজের মনেই আর জোর লাগে না বাজনা শুনে। কী হল ভোলানাথের! গুরুবল কমে গেল না কি?

'হেঁসেলে-চাতালে বাজাগে যা।' গোরাশশী এবার

পষ্টাপষ্টি খেঁকিয়ে উঠল : 'ছেলেটার তুপরে জ্বর এসেছে হি-হি করে। ঘামন্ত গায়ে ঘুমুচ্ছে এট্টু এখুন। তুই রজ তুলে ওকে জাগিয়ে দিসনি খবরদার।' বলে চলে গেল অন্য কাজে।

গায়ের কাঁথা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গৌরহরি উঠে বসল ঘাই মেরে। ছ'সাত বছরের ছেলে। বুড়ো বয়সের নামলা ছেলে ভোলানাথের। বড় আদরের।

'জ্বর আর নেই বাবা। ঘাম দেছে। একটো বিড়ি দে কেনে এ ছামু।'

ভোলানাথ মুখের এঁটো বিড়িটা ছেলেকে এগিয়ে দিলে। তন্ময়ের মত ঢোলে চাঁটি মারতে লাগল।

'কী সোন্দর তুর বাজনা বাবা।' গৌরহরি উঠে পড়ল। দ্রুত কটা টান মেরে বিড়িটা ফেলে দিয়ে বাপের গলা জড়িয়ে ধরলে। বললে, 'আমাকে ঢোল বাজানো শেখাবি তুর মত?'

ঘুরঘুট্টি অন্ধকারে ভোলানাথ আলো দেখতে পেল। হ্যাঁ, ই ছেলেই তার নাম ফিরিয়ে আনবে—তার আর ভয় কি। পিছনে হাত বাড়িয়ে ছেলেকে পিঠের সঙ্গে জাপটে ধরে ভোলানাথ বললে, 'নিশ্চয় শেখাব। দেখে লিস এমুন ওস্তাদ বানিয়ে দেব কেউ তোকে পাল্লা দিতে পারবে না। কিন্তুক—' হঠাৎ গলা নামাল ভোলানাথ: 'তুর মা কি আজি হবে? ঢোল যে উর তু চক্ষের বিষ।'

'মা না আজি হয়, মাকে তু ছেড়ে দিবি।'

কান বড় খর গোরাশশীর।

'কি বুললি? হতভাগা আঁটকুড়োর বেটা। নামুনে, জকা, তিব্দ্দুশে। তুর বাপ আমাকে ছাড়বে? তুর বাপকে আমি ছাড়তে পারি না? তুর বাপ একটা কী! ঢোলের পাল্লায় হেরে যায় উ কি একটা মরদ? শ্যাল-কুকুর।'

হঠাৎ কি হয়ে গেল ভোলানাথ নিজেই বুঝতে পারল না। ঢোলের কাঠি দিয়ে পিটতে লাগল গোরাশশীকে। কোথাকার কি এক নিরুদ্ধ যন্ত্রণা ফেটে পড়ল এতক্ষণে। অনেক মনস্তাপ, অনেক অপমান, অনেক দগদগি।

'তুকে আমি ছাড়তে পারি না? এখুনি পারি। দূর হ মাগি ছেনাল, দূর হয়ে যা। যে পরিবার স্বামীর তুখ-সুখ বোঝে না তাকে দিয়ে লাভ কি পিথিমীতে?'

গোরাশশীও ছেড়ে দেবার পাত্তর নয়। হাতের কাছে যা পেল হাতা-লতা তাই ছুঁড়ে মারতে লাগল ভোলানাথের গায়ে-মাথায়। মুখে খই-ফুটন্ত গালাগাল 'বারোজেতে, বাঁশচাপা, কাঁচা-বাঁশে-যা—'

কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল গৌরহরি।

কাঁধে আসে কাঁধে যায়, উলটে পড়ে মার খায়।

ঢোলের মতই সম্মান ছিল গোরাশশীর, অথচ ঢোলের মতই সে পড়ে পড়ে মার খেল।

চৈত্রে গাজন-বোলান, রথে সারি, পাল-পরবে কবিগান—কত ডাক-হাঁক ছিল ভোলানাথের। নহবতের সঙ্গে সঙ্গত

করতে তার আর কেউ জুড়ি ছিল না। দশখানা গাঁ তার নামে 'ম'-'ম' করত। সেই ঐশ্বর্যের দিনেই তো এসেছিল গোরাশশী। কিন্তু এক দিনে হঠাৎ সব উপে যাবে কেন? পর্বত এড়িয়ে এসে শেষে সর্ষে বিঁধবে?

আজ তিন দিন ভোলানাথ বাড়িছাড়া। সংসার ছেড়ে বিবাগী হয়ে যখন সে যাবে তখনো কাঁধে তার ঢোল চাই।

'তুর বাবা যদি আজ আলছে তো আলছে, নইলে চ, কালকে আমরাও চলে যাই গোররহাটি—তুর মামাবাড়ি।' গোরাশশী বললে গৌরহরিকে।

'তাই চ।' স্বচ্ছন্দে ঘাড় নাড়ল গৌরহরি। বিজ্ঞের মত মুখ করে বললে, 'বাবা যদি ফিরে এসে তুকে দেখে, আবার না তোকে মারধোর করে।'

'উঃ, তুর বাবা এক পেকাণ্ড ঠেঙাড়ে এয়েছে! এবার তবে আমি বঁটি দিয়ে কোপা করব।'

মায়ের গা ঘেঁষে সরে বসল গৌরহরি। চিন্তিত মুখে গম্ভীর গলায় বললে, 'সেদিন লেবারণের মা কি বলছিল জানিস?'

'কি?'

'বাবা না কিনি সাঙা করে বাড়ি ফিরবে।'

'ঘর বাঁধতে দড়ি, বিয়ে করতে কড়ি। তুর বাবা টাকা পাবে কুথা। বুড়ো-হাবড়ার কাপ কত! একটা বো আনতে পারে না তায় আবার সাঙা! একবার ঘরকে ফিরুক না পোড়ারমুখো।'

'কিন্তু সাঙা করলে তুকে তখুন তেড়িয়ে দেবে যে।'

'আমিও অমুনি পেহ্লাদ মুচিকে সাঙা করব। ফুটো কলসি আর বিড়বিড়ে ভাতার লিয়ে আর ঘর করব না। চাষে-বাসে পেহ্লাদ মুচির সছল-বছল অবস্থা, সুখে থাকব। আর থাকব এই গাঁয়ের উপরেই, তুর বাবার চোখের ছাঁমুতে—'

হঠাৎ আঙিনায় কার ছায়া পড়ল।

আর কার! ভোলানাথের। সঙ্গে আবার ও কে?

'তুর লজ্জা করে সান কাড়তে হবে না।' মোলায়েম গলায় বললে ভোলানাথ: 'ইয়ার নামই তারাপদ—সিই নামকরা বাজিয়ে। লজ্জা নেই, উ আমার ভাই হয়, জাত-জ্ঞাত নয়, একেবারে আঁতভাই—বুললি? বলি, ভাত-টাত কিছু আছে?'

এ কী বিঘটন!

ঘোষহাজরাদের বাড়িতে কবিগানের বায়না জুটে গিয়েছিল ভোলানাথের। পাল্লাদার সেই তারাপদ। ঐ দূরের গোঁসাইপুরেও তারাপদের বায়না! এরি মধ্যে খুব নাম ছড়িয়েছে তো ছোকরা। ভোলানাথের মাথাটা ঠিক খাবে এতদিনে। ভরা-ডুবি করাবে।

না, ল্যাজ গুটোবে না ভোলানাথ। এবারে ঠিক টক্কর খাওয়াবে ছোকরাকে। বাঁশের চেয়ে কঞ্চি টঙ্ক এ কথা মেনে নেবে না কিছুতেই। একবার হেরেছে বলে বারে বারে

হারবে এ বিধেন হতে পারে না দেবতার। হেই বাবা রুদ্দ্‌দেব!

গানের শেষে তারাপদ নিজেই এসে দাখিল হল ভোলানাথের সামনে।

'দাদা কি বাড়ি চললা আজই?'

'হেরে গেইচি, আমাকে আর খাতির করে কে নেমন্তন্ন করবে বলো? তুমার কথা আলাদা। তুমার ছোকরা বয়েস, সোন্দর চেহারা, তোমাকে পায় কে। তুমি এখুন ইনাম লেবা বকশিস লেবা তবে তো যাবা। আমি কালা মুখ দেখাতে থাকব ক্যানে এ ঠিঁয়ে?'

'উ শালোরা কী বোঝে শুনি?' তারাপদ রাগ করে উঠল: 'উয়ারা যে রায়ই দিক, আমি দিব্যি গেলে বলতে পারি তুমি আমার চেয়ে ঢের বেশি ওস্তাদ। ওস্তাদ ছাড়া ওস্তাদের গুণ কেউ বুঝে না। তুমি আমার গুরু, আমি তুমার শিষ্য-সখা।' তারাপদ হেঁট হয়ে পা ছুঁতে গেল ভোলানাথের। 'কারু জলে যশ কারু ছুধে ঠস। ও-সব বিচের-আচার কিছু লয়।'

ভোলানাথের মন মধু হয়ে গেল মুহূর্তে। ছেদ্দা-ভক্তি আছে ছোকরার। প্রবীণ লোককে মান্য করতে জানে।

'আমাকে তুমি শিখিয়ে-পড়িয়ে দাও। তুমার পায়ের তলায় বসে আমি এখুনো দু-দশ বছর শিখতে পারি।'

তারাপদ বললে গদগদ হয়ে। ওর সরলতায় ভোলানাথের বুক শীতল হয়ে গেল।

'পীরের চেয়ে খাদিম জিন্দে।' পথের লোক কে টিপ্পনি কাটলে।

সত্যিই তো। তারাপদ নিজে স্বীকার করলে কি হয়, দেখিয়ে দশ জন তো তা স্বীকার করছে না। তারাপদের নিজের স্বীকারে কী যায় আসে। ভোলানাথের প্রাধান্য মেনে নিয়ে সে তো আর কিছু কম বাজাবে না বা হেরে যাবে না তো ইচ্ছে করে।

'চলো কেনে দাদা মদের দোকান পানে। গা'টা বড্ড ম্যাজম্যাজ করছে—'

দুজনে গেল মাতালশালায়। গলা পর্যন্ত মদ খেলে। গলায়-গলায় ভাব হয়ে গেল দুজনের। তারাপদ ভবঘুরে বাউণ্ডুলে। চি-পুত্তু-ভাই-বুন কেউ নাই, নাই ঘর-দোর কপাট-চৌকাট। ইখানে-উখানে ঘুরে বেড়ায় আর ঢোল বাজায়। রং-টপ্পা গায়েন করে।

'বলেহারি বাবা ভোলানাথ, তু একটা গোটা-মরদ বটে!' তাদেরই গাঁয়ের শুকদেব মদ খেয়ে ঢোল হয়েছে। বললে জড়ানো জিভে, 'আঃ, কী মারটাই না মারলি। তা জব্দ করতে তুই জানিস বটে বাপ!'

'দূর দাদা।' তারাপদ নালিশ করে উঠল: 'মেয়েলোকের গায়ে হাত তুলবি ক্যানে? যা বলতে হয় লুলুপুতু করে

বলবি। আগ চণ্ডাল! ঠিঁয়ে অঠিঁয়ে লেগে গেলে বাবা কী হয় বলা যায় না। কথায়ই বলে, মুখে এখে বাক্যি আর ঠাঁই দেখে মার।'

ভোলানাথ থমথমে গলায় বললে, 'ফতুরে মরুক চামচিকে বসে আছেন ছিরাধিকে। তুমি শালো যত খেটে মর বোর কিছুতে মন পাবে না। হাতে কি আর অনথক মার আসে?'

'মনের বেপারে কামটা কী আমাদের? যৈবন বৈমুখ না হলেই হল। কি বল?' কনুই দিয়ে পাশের লোকটাকে তারাপদ গুঁতো মারলে।

হঠাৎ ভোলানাথ উপর-পড়া হয়ে জিগগেস করলে তারাপদকে: 'আমার বাড়ি যাবি?'

আড়ালে পেয়ে গোরাশশী ঝাঁজিয়ে উঠল: 'ই আপদ জোটালে ক্যানে?'

ভোলানাথ বললে গম্ভীর হয়ে, 'আমার খুশি।'

'তুর মুণ্ডু। একে পিতিদিন ভাত এঁদে দিতে হবে না কি আমার?'

'হবে, নিশ্চয় হবে। উ আমার ছোট ভাই, আমার সাগরেদ।'

'ছুচোর সাগরেদ চামচিকে। আমি লারব ভাত আঁদতে।'

'লারবি তো পথ ত্থাখ। আমি আমার পথ অ্যানেক আগেই দেখে লেছি।'

ধাপচালায় শোবার জায়গা হয়েছে তারাপদর।

নিশুতি রাত ঝাঁ-ঝাঁ করছে। কুটুরে পেঁচা ডাকছে কোথায় ঘাপটি মেরে। ঝাঁপ ঠেলে টুক করে ঢুকে পড়ল গোরাশশী।

বুকে যেন কে তার ঢেঁকি কুটছে। গলা ডুবিয়ে বললে, 'কি গো, লজরে ধরে আমাকে?'

তারাপদ আকাট, অসাড় হয়ে রইল।

'কি, আনারে ঠিক ঠাহর হলছে না? দিনমানে দেখে হিয়ের ভেতরটা খলবলিয়ে ওঠেনি এটটু? কি রে, আ কাড়িসনে ক্যানে? শরীলে সান নেই?'

তারাপদ যেন পাথারে পড়েছে। এ কবি-কালদমন, সারি-বোলান, ছড়া-পাঁচালি নয়। এ একেবারে অদ্ভুত! আরেক রকম!

'শুন, আমার গা ছুঁয়ে পিতিজ্ঞে কর—এ তল্লাটে আর আসতে পারবি না। ই দেশ-গাঁ ছেড়ে চলে যাবি ভিন দেশে। কি, আজি?'

'আজকের ই আত ছাড়া আর সব ছাড়তে পারব।' ধরা-গলায় বললে তারাপদ।

'শুন, তুর জ্বালাতেই আমাদের সব যেতে বসেছে। ঘরে সুখ নাই মনে সুখ নাই। ক্যাবল ওজকারে কি হয়, যদি নাম না হয় ভোমগুলে? ভেরেণ্ডা বনে শ্যাল-রাজা ছিনু, তু কেন বাদ সাধতে এলি? কথা দে, যদি পিতের পুত্তু হোস, এ মুলুক ছেড়ে চলে যাবি নিব্যনেদ হয়ে।'

'আর ল্যাই করিসনে। বুলছি চলে যাব, কথা রাখব।'

'তুর ভাবনা কি। তুর গুণ আছে, যেথা থাকবি সেথা ক'রে খেতে পাবি তু। আমাদের বড্ড অভাবের সংসার—দেখতেই পেছিস, তাই ব্যাগত্তা করছি তুকে—'

'তুর ভয় নেই। আমি ঠিক চলে যাব। ওস্তাদের সেঁথো আমরা, কথার লড়চড় জানি না।'

কুটুরে পেঁচাটাও থেমে গেছে এতক্ষণে। আঁধার যেন দম বন্ধ করে বসে আছে ঘন হয়ে।

'এই লে, টাকা লে।' তারাপদ একটা দশ টাকার নোট ধরল এগিয়ে।

'আ মর, টাকা লেব ক্যানে? তুর কাছে ই-র দাম দু-দশ টাকা বটে, কিন্তু আমার কাছে তার হিসাব নাই। তুকে হাটে গিয়ে দশবার বিচতে পারে এমুন নোকের অভাব হত না আমার কখুনো। বুললি? কাল ঠিক চলে য্যাস কিন্তুক। চলে যাস বেপাত্তা হয়ে। মনে থাকে যেন। তুর ধম্ম তুর ঠাঁই।'

'কিন্তুক কি বলে চলে যাব? কিছু তো বলতে হবে দাদাকে।'

এক পলক স্থির হয়ে দাঁড়াল গোরাশশী। বললে, 'লোটটা তবে দে।'

সকাল বেলা চৌকাঠের নীচে আঙিনাতে গোরাশশী মাড়ুলি দিচ্ছে, তারাপদ বেরিয়ে এল। বললে, 'চললাম, জন্মের মত চললাম—'

'ডাঁড়া, পাড়াশুদ্ধ লোক ডাকছি এখুনি, তোর এতবড় আস্পদ্দা!' গোরাশশী ফণা-তোলা সাপের মত হিসহিসিয়ে উঠল: 'তু আমাকে টাকা দেখাস? হাড়হাবাতে পিণ্ডি-খেকো, টাকা তুর বেশি হয়েছে, লয়? বেরো তু আমার বাড়ি থেকে—'

'আমি যেছি, তু কুট কাটিস নে। দে আমার টাকা ফিরিয়ে দে।' তারাপদ হাত বাড়াল।

'লে—খালভরা, নামুনে—' নখের ডগায় গোরাশশী নোটটা টুকরো-টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলল। উড়িয়ে দিল চার দিকে।

গোলমালে ঘুম ভেঙে গেল ভোলানাথের। দেখল তারাপদ বাড়ি নেই। উঠানে ছেঁড়া নোটের টুকরো।

কী ব্যাপার?

'তুর সেই কমবক্তা হতভাগা বন্ধু আমাকে লোট দেখায়!'

'দেখাবেই তো। তাই তো উয়ার সঙ্গে কথা। ঘর-দরজা নেই, মা-বুন-স্তি-পুত্ত নেই, এইখানেই খাবে-থাকবে। ভাত-মদ দেব, যত্ন-আত্তি করবি। আর উ পাল্লাদারি করবে না। আমার মুখ ছোট করবে না, কালি দেবে না নামে। বায়না যদি লেয় বিদেশে লেবে, আমার ইলেকায় লয়। তু তাকে ভাগিয়ে দিলি? টাকা যদি দেয়, ভাড়া দিয়েছে আগাম। ইর মধ্যে অন্যায়টা কোথায়? আমাকে না দিয়ে তুকে দিয়েছে। স্বামীকে না দিয়ে তার পরিবারকে

দিয়েছে। দেবেই তো একশো বার। যা রয়-বয় তাই হয়। তাই হবে। তাইতেই উ এয়েছে। উকে লিয়ে এসেছি। ইতে এত ত্যাজ ক্যানে? ঘরে ভাত নেই, ধম্মের উপোস!'

ভোলানাথ ছু হাতে পিটতে লাগল গোরাশশীকে। আশ্চর্য, গোরাশশী উত্তর দিলে না এতটুকু। না সাড়া না ধারা নিথর হয়ে পড়ে রইল।

'হা টে শালি, আমার নাম বড়, না তুর নাম বড়?'

ভোলানাথের নাম বড়। গোরাশশী তা জানে। মর্মে-মর্মে জানে।



হাট-বাজার

'ছুরদিশে আছি বাবা, ছুখ-ভিখ করে খাই।' বুড়ি বললে হাঁপাতে হাঁপাতে। 'আমার ঠিঁয়ে কিছু লিও না।'

এক ঝুড়ি আনাজ নিয়ে বসেছে বুড়ি। শুষনি-কলমি, পুঁই-ডাঁটা, থোর-কাঁচকলা নিয়ে।

পাশে ঐ হাস্যমুখীটি কে? ক্ষারে কাচা খাটো একটি শাড়ি পরে জড়িপটি খেয়ে বসে আছে। চাইছে মিটির মিটির করে। ডালার আনাজপাতির মতই তরতাজা।

'ইটি কে?'

'আমার ব্যাটার ছেলে। ছেলে মানে মেয়ে। আমার ব্যাটার কথা আর বুলো না। ব্যাটা বিশ্বঘাতী। খেতে-পরতে দেয় না আমাদের। নতুন সাঙা করে শরীলে উর বল বেঁধেছে। ছুর-ছুর করে তেড়িয়ে দেছে আমাদেরে। বাড়ির এক কোণে তাল-বাকড়ার কুঁড়ে বেঁধে আছি ছুজনে। অথচ বাড়ির জমার রেকট-পরচা সব আমার নামে। ট্যাকসো-খাজনা আমাকেই টানতে হয়। নইলে বলো খাজনা বাকি ফেলে প্যাটের ব্যাটাকে কি উচ্ছেদ করাতে পারি? কিন্তু এমন ডেকো হারামজাদা, এতটুকু ছেদ্দা-ভক্তি করে না, ডেকে শুদোয় না, আক্রাগণ্ডার বাজারে একটা পয়সা ছুঁড়ে দেয় না। এই ছাখ না, বাছার চুলে এতটুকু ত্যাল নাই।'

রুখু চুলে ঢলকো করে খোঁপা বাঁধা মেয়েটার। বুড়ি

ভেঙে দিল সেই চুলের ঢিবি। মেয়েটা বিরক্তির ভাব করে একবার একটু কাঁধ ঝাঁকালে।

'তবে তোমাদের চলে কি করে?' পিঠ-ঢাকা চুলের দিকে তাকিয়ে রইল ত্রিভঙ্গ। খাতার পৃষ্ঠাটা আঙুল দিয়ে আটকে রেখেছিল, কখন ছেড়ে দিল আলগোছে।

'যেদিন খাটি সেদিন খাই। হয় ধান ভানি নয় শাকপাতা তুলি। এক যাগায় খাল কেটে আরেক যাগার খাল ভরাই। ভগার মার তুনিয়ার বার, বাবা—'

'তোমার ই নাতনীর বিয়ে হয় নি?'

'হয়েছিল বৈ কি। বুলো না সেই কলঙ্কের কথা—'

মেয়েটা ঝাঁজিয়ে উঠল: 'কত তোলা-খাজনা তাই দিয়ে দে ক্যানে! গল্প না মেরে গাহেক-খদ্দেরকে আসতে দে।'

যেন পুঁই-ডাঁটা থোর-কাঁচকলারই গাহেক যত তুনিয়ায়!

কিন্তু কেচ্ছা কাহিনীটুকু আদায় না করে ত্রিভঙ্গ ছাড়বে না। কলঙ্কের কথা যখন, তখন নিশ্চয়ই আশা আছে।

যা ভেবেছিল তেমন কিছু নয়। গাঁ-ঘরে যা হয় ততটুকুও না। ভাত দেবে না বলে স্বামী খেদিয়ে গিয়েছে। সেই অবধি আছে এমনি ঠেকা হয়ে।

'খেদিয়ে দিয়েছে ক্যানে?'

'লজরে ধরেনি নাকিনি। চাঁদের কোণা বউ ছেড়ে ধরেছে এক ভূতনীকে। বলে, বউ যদি হয় চাঁদের কোণা, তবু পিরিতের পেত্নী সোনা। নিজের ধম্ম মাটি করেছে—এখন

ব্যামোয় ধরেছে অনামুকোকে—মরবে, মরবে, ক্ষ্যান্ত হবে উ বাঁশচাপা—'

কিন্তু অনর্থক কি আর ছেড়েছে মেয়েটাকে? নিশ্চয়ই ছুঁয়ে গিয়েছিল। রঙ-রসের ছিটে লেগেছিল হিয়ের মধ্যে। আপথ-কুপথে পা দিয়েছিল আর কি।

'উ সব নেই বাবু আমাদের মধ্যে। আমাদের মধ্যে বেচাল কম। আমরা ধম্মপথে থাকতে জানি। ধম্মপথে অধিক রাতেও ভাত হয়। তাই তো বলি লাতনীকে, ধয্য ধর, ধানের ভেতর একদিনেই কি থোড় হয়? থোড় হয় কেমে-কেমে—'

নাতনী ঝামটা মেরে উঠল। ত্রিভঙ্গর দিকে তাকিয়ে বললে, 'কি, লাগবে নাকি তোলা-খাজনা?'

বর্ষায় ফোটা কেয়া ফুলের ছড়ার মত দেখতে মেয়েটাকে। শিরের দিকে ঘন সবুজ, ঢালের দিকে সাদাটে আভা। ঘন যৌবনের আড়ালে লজ্জার উঁকিঝুঁকি, গন্ধটি মৃত্থ-মৃত্থ।

'কি, কত লাগবে? রা কাড় ক্যানে? রা না কাড় তো সরে যাও ছামু থেকে। বিক্রি-বেসাত করতে দাও।'

কেয়াছড়ার গায়ে খুদে-খুদে কাঁটা।

'না, লাগবে না।' একটু ঝুঁকে এল ত্রিভঙ্গ। বললে, 'তোমার নামটি কি?'

'ক্যানে? নাম দিয়ে কী হবে? খাতায় লিখে আখবে নাকি?'

ত্রিভঙ্গ সরে গেল।

যে সব বিকুনীদের টাট আছে ধরাবাঁধা, তাদের মধ্যে ছু'জন সীমানা নিয়ে ঝগড়া করছে। দীঘে-পাশে হাত মেপে এলেকা ঠিক আছে যার-যার, তাকেই বলে টাট—নিকিরির টাট। কে কার চৌহদ্দি ডিঙিয়ে কাঁচামাল রেখেছে তাই নিয়ে শুরু হয়েছে কলহ। ত্রিভঙ্গের তা মিটিয়ে দেবার কথা। ও সব যেন তার লক্ষ্যের মধ্যেই নয়। বারে-বারে তার চোখ উড়ে যাচ্ছে ঐ মেয়েটার চোখের দিকে।

'আমার কাছ থেকে আলু নিলে সেরে সতেরো ছটাক পাবে। আমি কয়েলি করি, মণ প্রতি চার আনা মজুরি—আমার কি! চলে এসো চটপট—' আলুর কয়েলি হাঁক দিচ্ছে। সেখানে একটু দাঁড়াতে হয়। কয়েলিরা সব মহাজনের দিকে, পাইকারের দিকে নয়—দেখতে হয় কোনো ঠক-ঠকানো হচ্ছে কিনা, বাজারের কোনো ছুর্নাম হচ্ছে কিনা। কিন্তু কে দেখে! মন পড়ে রয়েছে আনাজের ঝুড়িতে।

বাজারের গোঁজা সাফ করতে আসেনি আজ মেথর। তাকে এখুনি ডাকানো দরকার। খাটালে নোংরা জমে আছে। কিন্তু কে ডাকায়! কার গরজ পড়েছে!

চারু জেলেনী আর দাসু মেছুনীতে লেগে গেছে খিস্তি-খেউড়। ও অমন লেগেই থাকে। ওদের মাঝখানে গিয়ে পড়বার কোনো মানে হয় না। ওসব নোংরার মধ্যে না গিয়ে দূরে দাঁড়িয়ে বরং কান পেতে থাকুক মেয়েটি হঠাৎ হেসে ওঠে কিনা।

বিত্তেলরা বাজারে নতুন এসেছে। ওদের তোলা ঠিক করতে হবে। বাঁশের কাজ করে ওরা। টোকা-টুকুই, ডালা-ডালি, সাজি-ঝাঁঝুরি, ছাতা-মাথালি, চাটাই-তালাই—কত কি বোনে। ওগুলোর নাম বিত্তি। আর এই বিত্তি বুনে খায় বলে এরা বিত্তেল। চলতি কথায় ডোম।

কিন্তু কে বসে-বসে এখন ফর্দ-ফিরিস্তি তৈরি করে। ও হবে এখন আরেক দিন।

মেয়েটার শাড়ির আঁচলের দিকটা ছেঁড়া। যতই কেননা ঘুরোও, কিছুতেই ঘের পায় না।

দু' থকা ডাব নিয়ে এসেছে কে বেপারী। ডাবের তোলা কত? দেখতে হবে লিস্টিটা। কাঁধ ধরে না গুনে গুনে? দেখে নিলেই হবে এক সময়। ব্যস্ত কি!

কিন্তু ঐ খেতোয়াল যে এরি মধ্যে এক ঢাকি পটল বিক্রি করে তোলা খাজনা না দিয়েই পালিয়ে গেল। এখনো পেছু নিলে ধরা যায় লোকটাকে। কে আবার ছুটোছুটি করে! চেনা লোক, খরগাঁর খুদু দত্ত। আজ না দিয়েছে কাল দেবে। যাবে কোথায়?

কিন্তু ও কি ফের ঐ খোলা চুলে চুড়ো বাঁধবে না? অমনি মেঘ হয়ে পড়ে থাকবে?

এই দেখ, কে এসেছে। পরনে চটকদার শাড়ি, গায়ে গয়না—দেখলেই বোঝা যায়। হেলন-দোলন কত! দু'গাল ভরে পান খাচ্ছে আর রাঙা ঠোঁটে পিচ কাটছে।

এ দেশেরই মেয়ে। অন্তা বাগদির বোন। কি ছিল কী হয়েছে। আগে-আগে শ্যাওড়া গাছে বসে থাকলে লোকে দিনে-তুপুরে ভিরমি খেত। এখন গমক দেখে তু' চোখে সবাইর ঝলস লাগে। কলকাতা থেকে ভোল ফিরিয়ে এনেছে। নোনা কাটিয়েছে কথার। এলেম-গেলেমের দেশের মানুষ এলুম-গেলুম ধরেছে। আগে সবাই বলত, নেন্তি। এখন বলে, দিদি, ঠাকুরঝি।

মাটির উপরে নলপাচ্ছে বিত্যুতের মত। সবাই ঘাড় ফিরিয়ে-ফিরিয়ে তাকায়।

'পূব পাড়ার সেই নেন্তি গো—কলকাতা হনে বাড়ি আলছে।' বিকুনীরা বলাবলি শুরু করে: 'গয়না কত লো! এক গা। তেমনি বাহারের শাড়ি। লয়?'

'মিনসে লেয় না পায়ের কাছে, মাগী বলে ভালবাসে। এখানে পড়ে থাকলে কী হত? ওগে-ওগে চেহারা হত এমনি কাটিপারা, সাল-বছর ছেলে হত একটা করে। তারপর সোয়ামী একদিন লাথ মেরে 'ছেই' করে দূর করে দিত। তখন মর ক্যানে তু মাগী।'

মনে-মনে সবাই পাপের গরমাই দেখছে। নিজেরো অজান্তে একটু বা দোষ দিচ্ছে অদেষ্টকে। কিন্তু ও মেয়েটা একবারও এদিক পানে তাকাচ্ছে না কেন? ওর কি সাধ-সম্মানের ইচ্ছে নেই? শাড়ি-গয়না কি ও পছন্দ করে না?

কিসে আর কিসে! মধু আর বিষে। বাঁশির কাছে ঢাকের বাড়ি।

সে কি? সব বিক্রি হয়ে গেল এরি মধ্যে? আর, যেই বিক্রি হয়ে গেল অমনি বাড়ি ফিরে চলল ওরা? একটিবার ফিরেও তাকাল না?

'তোমার নামটি কি?'

'ক্যানে? নাম দিয়ে কী হবে? খাতায় লিখে আখবে নাকি?'

আগে-আগে যাত্রাদলে গান করত ত্রিভঙ্গ। কবি ঝুমুর কালদমন রামায়ণ কীর্ত্তন শারিবোলান ছড়া-পাঁচালি—খুব রাবরবা ছিল তার। গান শুধু গাইতে পারত না, বাঁধতেও পারত।

ছুটি হাত নেড়ে-নেড়ে চলে যাচ্ছে ও। খাটো শাড়ির ঘেরটি পায়ে-পায়ে ঘুরে-ঘুরে যাচ্ছে। ত্রিভঙ্গর বুকের মধ্যে গানের একটি পাখি ছটফট করে উঠল :

'কোথা যেছ রে ওরে হাত ছুটি নেড়ে
ছু'টি পায়ে-পায়ে শাড়িখানি ঘেরে!
বাছা, নাম জানি না, ডাকব কি বলে
ডাকার আগেই চোখে জল আসে চ'লে।
আমার নাম নিয়ে তোর কি কাম কিসে,
আনগা কলম নাম লিখে লিসে—
কালিতে নয় নাম যে লেখা বুকের অনলে॥'

কি হল ত্রিভঙ্গর কে জানে। বিয়ে-থা করেনি, উড়ে উড়ে বেড়িয়েছে—মনটা হঠাৎ পোষ মানতে চায় যে।

গুটি-গুটি গেল সে এক দিন বুড়ির তালাসে।

'এই ছ্যাখ্ পেবাতি, কে এসেছে—'

বাঁশবনের নিচে খালের ধারে মাছ ধরছে পেবাতি। পলুই দিয়ে ধরছে। শির-শির করে ঝরে পড়ছে বাঁশপাতা। জায়গাটা আঁধুল।

'তোমার নামটুকু জেনে নিলাম।'

'কিন্তুক আমাকে জানলে কি?' পেবাতি চোখ টলটলিয়ে হাসল: 'ঘরে-দোরে হাভাতি, আমার নাম পেবাতি। বলো তো এটা কি? আঁচির-পাঁচির চাঁচের ঘর, মাথা দিয়ে রাস্তা কর।'

'তোমার হাতের ঐ মাছ-ধরা পলুই।' একবাক্যিতে বলে উঠল ত্রিভঙ্গ। 'আচ্ছা ইটা বলো তো? উপর থেকে পড়ল ছুঁড়ি, ছুঁড়ি বলে আমি সাতপাক ঘুরি।'

'আহা, ই কে না জানে! বাঁশপাতা গো বাঁশপাতা!'

'আর কিছু হয় না?'

'হয় গো হয়।' ঘাড় ফিরিয়ে পেবাতি হাসি লুকোলো। বললে, 'যাও ক্যানে বুড়ির ঠিঁয়ে।'

হ্যাঁ, ঐ সাত পাকই ঘুরতে হবে। বুড়ি বলে, আমাদের সমাজে বিয়ে-সাঙার কদর এক। এটা বিয়োলো মাগের ছেলে, ওটা সাঙালো মাগের ছেলে—তফাৎ নেই।

খাতির কেরু কম-বেশি নয়। সম্পত্তির ভাগও সমান-সমান।

মুখ ফলে তো ক্ষ্যাৎ ফলে না। ক্ষ্যাৎ ফলে না আমার, কিন্তু মুখ ফলেছে। পোড়ারমুখো নাত-জামাই মরেছে কাল তুপুরে। নাতনী আমার বেধবা হয়েছে, আর ভাতে হাত দিতে গিয়ে ছাইয়ের গাদায় হাত দেবে না। ভদ্দ-গেরস্ত দেখে ইবার ওর সাঙা দেব।

কথার মাঝে কোথায় যেন একটু লুকোনো তেজ। থাকা করে থাকতে হবে পুরুত ডেকে মন্তর পড়িয়ে, গাঁয়ের পঞ্চজনের মজলিসে। অমনি রাখারাখিতে চলবে না। কিছুতে না। খেতেই দাও আর পরতেই দাও, সঙ্গে-সঙ্গে তোমার জাত দিতে হবে। মনে যদি রং ধরে থাকে তবে আর জাতের ঢং ক্যানে? রোচে পোচে খাবা, মন থাকে তো যাবা। কে তোমাকে আটকায় হে?

বুকের মধ্যে জোরে ধাক্কা খেল ত্রিভঙ্গ। একেবারে বিয়ে করতে হবে, বিয়ে করে ঘরে বউ তুলতে হবে বরণ করে। এ যে একেবারে কাট-কাট কথা।

পেবাতিরও তেমনিতরো ধরন-ধারন। খসে-ধসে টলে পড়বার মত নয়। বলে, লাজুক চোখে হাসি লুকিয়ে বলে, 'বউ হব। ঘর বদল করব। এ মেঠো ঘর, দরজা বারজালা নাই, কাঠায় কাঠায় ঘসি। হেতা কি মন বসে? উড়ে যাব তুমাদের কোঠাঘরে।'

শুধু ঘর নয়, জাত বদলাতে চায়। বাড়ির কথা ভাবল একবার ত্রিভঙ্গ। বাড়ির কথা মানে বাপের কথা। বুকের ভেতরটা এতটুকু হয়ে গেল।

হালে তার বাপ জাত বদলেছে। ছিল চাষীকুনাই, টাকার মুখ দেখে হয়েছে এখন চাষাধোপা। উপরে উঠেছে। আগে অশৌচ ছিল দশ দিন, এখন ভাল ভদ্রলোকের মত বাড়িয়ে নিয়েছে তিরিশ দিনে। যাত্রা দল থেকে ছাড়িয়ে এনেছে ত্রিভঙ্গকে। এসব ভদ্দর-শূদ্দরের কাজ নয়। বলেছে, তু' যদি আমার হাঁড়ির ভাতের তোয়াক্কা করিস, আমার পা ছুঁয়ে কিরে খা, উসব ডোম-ডুমনীর সঙ্গে খেউর গাইতে যাবিনে। বাজারের ইজারা নিয়েছে মহাদেব। ছেলেকে বসিয়েছে তার তোলা-খাজনা আদায়ের গোমস্তা করে। গাঁয়ের পাঠশালে তু' তিন বছর যে সে ঘস্‌টে এসেছে তা জলে যায়নি।

অসবন্নি বিয়ে করতে হয়, নিচে থেকে উপরতলায় যা। সৎগোপের মেয়ে ধর। তা নয়, এখনো সেই হাড়াই-ডোমাই! তাহলে টাকা হয়ে কী লাভ হল? কথায়ই বলে, বনেদী আর বে-বনেদী। বাঁদরের চুল হয় না বাঁধতে জানেনা বলে। যার টাকা হয় তার জাতও হয়।

না, মনকে সামাল দিক ত্রিভঙ্গ।

কিন্তু মন মানে কই?

ভয় নেই, ও হয়ে যাবে আস্তে-আস্তে। পৃথিবীতে যে

যা চায় তাই পায়। যা রয় বয় তাই হয়। ঢোঁড় সাপ বাঁয়ে গেলেও যা ডাইনে গেলেও তা। যা খড় তাই নাড়া। যা রাখা-থাকা তাই বিয়ে। পেবাতি বুঝলেও বুঝতে পারবে না। ভাঁড় আনতে ষাঁড় পালাবে, ষাঁড় আনতে ভাঁড় পালাবে!

ধৈর্য ধরো। ধানের ভিতর একদিনেই কি থোড় হয়?

পরনে আস্ত-মস্ত শাড়ি পেল পেবাতি, চুলে গন্ধতেল, হাতে রূপদস্তার চুড়ি চারগাছা। সবচেয়ে যা বড় জিনিস, বিকুনীর টাট পেল—নিষ্কর। আজকাল পেবাতি ঝুড়িতে করে আনাজ-পাতি আনে না। পাইকারী দরে হাটে জিনিস কিনে হাটেই বেচে। থাকিয়ে দোকান হয়ে যাচ্ছে তার।

'ওর বুজি আর তোলা-খাজনা নাই?' পাশের থেকে নেত্য বাওরেণী ঝামটা দিয়ে ওঠে।

'ক্যানে লাগবে বলো?' ত্রিভঙ্গ সাফাই কাটে: 'ও মালের জন্য মহাজন তো একবার দিয়েছে, পাইকার আবার দেবে ক্যানে? উ তো বাইরের থেকে মাল আনছে না—'

'বাইরের থেকে আনলেই যেন খাজনা লাগত। দেখিনি এদ্দিন? কিন্তুক টাটের ভাড়া উ দেবে না ক্যানে?'

ত্রিভঙ্গ পাশ কাটিয়ে চলে যায়।

পেবাতি নেত্যর দিকে খেঁকিয়ে ওঠে: 'বলি, জানিস পোড়ারমুখি, কাঁটা গাছ বাড়ে কিন্তু হিংসার গাছ বাড়ে না।'

যাবার সময় ত্রিভঙ্গর পাশে দাঁড়িয়ে একটু খ্যানখ্যান

করে। বলে, 'ই হাট-বাজার আর ভাল লাগে না। সিঁতেতে সিঁদুর মাখিয়ে তুমাদের বাড়িতে লিয়ে যাবে কবে? তুমার বাবাকে ডাকাও না।'

'জাতনাশা, হারামজাদা, তু আমার হাট লোপাট করতে বসেছ? বেরো, বেরো তু ইখান থেকে।' মহাদেব মোড়ল গর্জন করে উঠল: 'খাজনা-তোলা আমি আদায় করব। তুকে দিয়ে কিচ্ছু হবে না।'

হাট ও তহবাজার ডাকস্থরতে ইজারা বন্দোবস্ত নিয়েছে মহাদেব। আদায় আমদানির বাজার। তাই জমিদার ঢোল সহরৎ দিতেই ঝাঁপিয়ে পড়ল মহাদেব। ডাকসিটে আর কারু নাম উঠতে দিলে না। এক ডাকেই ছিনিয়ে নিলে।

সেলামির টাকা আর নায়েব-নজরানা ডাক-অন্তে দেয়া হ'ল এক মুষ্টে। ডাক মঞ্জুর হ'লে খাজনার চৌথও চালানে ইরসাল দিলে। বাকিটা আর তিন কিস্তিতে আদায় দেবার চুক্তি।

আদায়-আঞ্জাম কিছুই করতে পারেনি ত্রিভঙ্গ। বিকুনীদের সঙ্গে আড্ডা জমিয়েছে আর রং-টপ্পার গান বেঁধেছে। ব্যবসা-বেপার সব তছনছ হবার দাখিল। বাকির পর্যন্ত হিসেব রাখেনি। এভাবে চললেই হয়েছে! দুধ বেচে মদ খাবার সামিল হবে। লাভের মধ্যে ব্যাং, লোকসানের মধ্যে ঠ্যাং।

'যদি এই বাগে আসবি, লাঠি দিয়ে ঠ্যাং ভেঙে দেব।' মহাদেব ত্রিভঙ্গর উপর লাঠি ওঁচাল। 'গুয়ো, ছুঁচো, পিণ্ডিখেকো হারামজাদা।'

'তু কে? কী বিচছিস? পটল? মাথামুটে পটল?'

পেবাতি ভয়ে মুষড়ে গেল।

'দে তোলা বারোটা পটল আর খাজনা দু'আনা। হ্যাঁ, পিতিদিন।'

'এ পটল আমি পাইকারী দরে হাটে হনে লিয়েছি। ইর তোলা-খাজনা মহাজন দেবে। হাটে কিনে হাটে বিচলে তোলা লাগে না।'

'উঃ, আমাকে আইন শেখালছে! হ্যাঁ, আমার আমলে যতবার বিক্কিরি ততবার তোলা। দে, বার কর।' মহাদেব লাঠি ঠুকল। 'কদ্দিন বাকি ফেলেছিস তার হিসেব দে।'

পেবাতি এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল আশ্রয়ের জন্য। ত্রিভঙ্গর ছায়াও দেখতে পেল না।

আশে-পাশে, তার জন্যে কোনো ভাবীসাবী নেই। সবাই তার শত্রু। সবাই তার কুট কাটে। সবাই এক একটি বিষের পুঁটুলি। দশজনের বিচার বলে যে একটা জিনিস আছে তাও আজ তার বিপক্ষ।

'টাট লিয়ে বসে আছিস যে, তার খাজনা কই? হাল নাগাৎ দে সব হিসেব বুঝিয়ে। না দিবি তো বেরো, বেরিয়ে

যা বাজার থেকে।' লাঠির খোঁচা মেরে পটলের ঝুড়ি উলটিয়ে দিল মহাদেব।

হ্যাঁ, এই পটলের ঝুড়িটাই এদ্দিনকার পাওনা-গণ্ডার ধারশোধ। খালি হাতে বেরিয়ে গেল পেবাতি।

ভেবেছিল বাজারের বাইরে দেখা হবে ত্রিভঙ্গর সঙ্গে। কোথায় ত্রিভঙ্গ! ভেবেছিল শুনতে পাবে তার গানের কলি। তার বদলে শুনতে পাচ্ছে সে বিকুনীদের কলকল্ল। সবাই ধম্ম দেখছে। সবারই তপ্ত 'রঙ্গ' শেতল হচ্ছে এতদিনে। থমথমে মুখ নিয়ে এক-পা এক-পা করে বেরিয়ে গেল পেবাতি।

তোমার কি? খেঁড়ো? তোমার কাঁকুর? তোমার কুলি-বেগুন? তোমার মুক্তকেশী? তোমরা তো চিরস্কেলে নিকিরি। তোমাদের ঠেঁয়ে ঠিকঠাক নোব। এক ঢাকি বা বস্তায় দৈনিক ছু' পয়সা খাজনা, এক পয়সা তোলা। কুমড়োর বেলায় খাজনা কিন্তু এক আনা। মাথামুটে পটলের খাজনা এক আনা, তোলা আটটি পটল। গাড়ি হলে খাজনা ন' পয়সা, তোলা বস্তা প্রতি চার গণ্ডা। আলু? খাজনা এক আনা, তোলা আধসের।

চাঁইমোল্লানীরা বসেছে। তোদের 'দব্যে' তোলা নেই। খাজনা ছু' পয়সা। যদি গাড়ি বোঝাই করে আনিস, যতদিনে বিক্রি হয়, গাড়ি প্রতি চার আনা। ডোম-বিত্তেলদের খাজনা তিন আনা করে। প্রতি হাটে বিত্তেল বসাবার জন্যে

কোল-ইজারা নেবে একজন। তার থেকে সেলামি আদায় দশ পয়সা। খড় আছে তোমার? তোমার খাজনা নেই। াকন্তু তোলা আছে বোঝা প্রতি এক আঁটি।

চল যাই পানপটিতে। পণ হিসেবে পান বেচছে। বড়গুলির নাম ঝাড়া, যেগুলো মিশুলি তার নাম সাবটা, আর বাছট পড়ে যেগুলো কুটি-কুটি হালকা পান সেগুলো ছোট। তিন পদই আছে তোমাদের। পিতিজনের খাজনা এক আনা, তোলা এক পণ ঝাড়া পান। না, না, সাবটা-কুটিতে চলবে না। নিটুট-নিখুঁত ঝাড়া পান চাই।

জেলো-মেছুনিদের পাড়াটাই বেশি জমজমাট। দর যেমন গরম, খাজনাও তেমনি শক্ত। মাথা প্রতি দেড় টাকা।

ছেঁড়া পুরোনো কাপড় বেচতে এসেছে হাটে। না, তোমারও ছাড়ান নেই। তোমার আর তোলা হবে কি? কাপড় প্রতি খাজনা দিও এক পয়সা করে।

এর মধ্যে জোর-জুলুমের কথা নেই। সমস্ত হার-দর রেট-নিরিখ জমিদারি থেকে মঞ্জুরি করা। ডাক-বন্দোবস্তের প্রস্তাবপত্রের তপশিলেই এসব ধরা আছে।

তবে একটা শর্ত। ঢাকি বা বস্তা অনুসারে খাজনার বৃদ্ধি ও কমি হবে। আর দ্রব্যের কদর অনুসারেও। গাড়িতে টাপা বেঁধে আম আসবে, সে আম কলুমে না জঙ্গুলে তা দেখতে হবে বৈকি। তেমনি দেখতে হবে আলু—দিশি না নৈনিতাল। আদা নতুন না পুরোনো। তেমনি তেঁতুল কাঁচা

না পাকা। তারপরে বস্তার ওজন বুঝতে হবে, বুঝতে হবে ঢাকির বেড়। মুড়ি আর চালভাজা কি এক ?

কী বল হে তোমরা ? এতে অন্যায় হচ্ছে কিছু ?

'কিছু লয়। এ তো খুব খাঁটি কথা। জিনিস বুঝে যেমন দাম তেমনি দাম বুঝে তোলা-খাজনা।' হাটুরেরা সবাই সায় দেয়।

ক'দিন পরে ত্রিভঙ্গকে সঙ্গে নিলে মহাদেব। দেখুক, শিখুক কি করে আদায়-উশুল করতে হয়। বিকুনিতে-বিকুনিতে জোটাজোট ঘটিয়ে কি করে দর তুলে দিতে হয়। আর চড়া দর পেয়ে কি করে চাড় দিতে হয় তোলা আদায়ের জন্যে। দর যদি বাড়ে তোলা বেশি দাও, তোলা যদি বাড়ে দর বেশি হাঁকো। এ তোমার রং-টপ্পার গান নয়। যে দিন-সময়, উদয়গিরি অস্তগিরি খেটে কি করে ছমুঠো সংস্থান করবে, তারই ভাবনা ভাবো।

দেখতে দেখতে হু-হু করে জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যেতে লাগল। একেবারে অগ্নিমূল্য। প্রায় চতুর্গুণ। একটা কাঁচকলা, একটা করলা এক আনা। আলুর সের এক টাকা। কুচো চিংড়ি আট আনা। এক পণ পান দশ আনা। ডাব একটি চৌদ্দ পয়সা।

বাজার-ভাও কি রকম চলছে ? বড় তেজ চলছে বাজারের। আমদানি কম, গাহেক বেশি। হাউইর মত দাম চড়ছে।

'তা হলে তোলা-খাজনার রেটও বাড়িয়ে দাও হারাহারি। কী বল হে খুদু দত্ত ?' মহাদেব তাগিদ দিল।

'তা অল্যায় বলেননি। সে তো আমরা আগুতেই বলেছি। আমাদের দু' পয়সা আসে, ভাগ আপনাকে দেব বৈকি। আপনার আশ্চয়ে আছি।' খুদু দত্ত মাথা নাড়তে লাগল।

'তেমনি উনিও আছেন আমাদের আশ্চয়ে।' বিষ্ণু বড়াল চোখ বড় করলে: 'হ্যাঁ, লিশ্চয়। লাঙল ছাড়া যেমন চাষ হয় না, তেমনি নিকিরি ছাড়া হাট বসে না। আমাদের দেখছেন উনি, ওনারে দেখছি আমরা।'

'আসলে আমরা এক দলে। এক খেয়ার জল।' বললে গুপী বারই। 'হালে-বলদে সুখ থাকলে যেমন চাষ হয় তেমনি হাটুরে-ইজারাদারে সুখ থাকলেই হাট চলে। আমাদের একদিকে ঝোঁকতা।'

'জমিদারের সঙ্গে আমাদের কোনো সমন্দ নাই। ও আমাদের থেকে ভেন্ন ও বিদিশী।' গম্ভীর মুখে বললে রাখাল সাঁতরা: 'কিন্তুক ঠিকেদার আর নিকিরি আমরা ই-উর জাতজ্ঞাত, এক পাড়ার পড়শী। হুঁকোর খোল আর নলচে, লাঙলের ফাল আর পাশি। আমি দিলে উনি খাবেন উনি দিলে আমি খাব। একজন সানাই, অন্যজন পোঁ।'

যত সব কথার ফুস্কুরি। শুকনো কথায় কি চিঁড়ে ভেজে ? কত দিবি তাই বল।

'হারাহারি লারব মশায়। ডবল লাও ক্যানে।' বললে মুরুব্বি গোষ্ঠ কুনাই।

'আপাতত তাই হোক। কিন্তু খেয়াল রেখো, বাজারের যদি আরো প্রচণ্ড তেজ হয় তা হলে আধেক-খানেক আরো বাড়িয়ে দিতে হবে।'

'সে আর বলতে! আমরা কি পেরথক?'

দু-তিন খানা বাসিন্দে ভাড়াটে আছে বাজারের মধ্যে। ফল-ফুলুরির দোকান, কাটা কাপড়ের দোকান আর একখানা মশলাপাতির। 'তোমরা কি বল হে? যে দিন-সময়, ভাড়া তো বাড়িয়ে দিতে হয়।'

'তা দিতে হবে বৈকি। একই তীর্থের যাত্রী আমরা। ডুবি-ভাসি একসঙ্গে। একা নদী বিশ কোশ।'

'তা হলে তোমরাও ঐ ডবল করেই ভাড়া দিও।'

তাই দিতে হবে। সবাইর যখন ঐ লাগনা?

ত্রিভঙ্গের দিকে গর্বের ভঙ্গিতে তাকাল মহাদেব। কত সহজে দাঁও মারছে সে, প্রায় ভাঁওতা মেরে। তার ইজারার খাজনা-সেলামী আর বাড়বে না, তার খরচ-খরচায় টান পড়বে না, মাঝখান থেকে তার নিটোল নিট মুনাফা। জিনিসের দাম যখন বাড়ল তখন তার বাজারের মর্যোদাও বাড়ল।

শিখে রাখ, একেই বলে টাকা দিয়ে টাকা ডাকানো। আচোটে ফসল ফলানো। একেই বলে আচকা আদায়।

শিখে রাখ, কাকে বলে লাভের কড়ি। হাঁটুর উপর তাল ঠুকে-ঠুকে এ তোমার রং-টপ্পার গান গাওয়া নয় বসে-বসে।

কড়ি বিনে হরি পর্যন্ত মেলে না।

চাকা পাক ঘুরল।

দেশে এল কনট্রোল।

কী কনট্রোলই এল! যেটায় চোখ পড়ল, সেটাই গণেশের মাথার মত উড়ে গেল বাজার থেকে।

চাল গেল, চিনি গেল, কেরাসিন গেল, কাপড় গেল। জাল বোনবার সূতো নেই। কাপড় কাচবার সোডা নেই। বিড়ি ধরাবার দেশলাই নেই। মাথায় দিতে একটা ছাতা জোটে না। যেদিকে তাকাও সেদিকে শূন্য মাঠ খাঁ খাঁ করছে।

এখুনি হয়েছে কি। কন্‌ট্রোল বসল বাজারের জিনিসে, আনাজ-পাতিতে।

বসবে না কেন? এই এক লতা পুঁই বলছ চার পয়সা, মোচা বলছ তিন আনা, লালপোস্কা শাকের সের হাঁকছ পাঁচ আনা করে। ঘুসো চিংড়ি বারো আনা। গরিবগুর্বো লোক খাবে কি করে? অশ্বত্থামার দুধ খাওয়ার মত খাদ্যির নামে অখাদ্যি খেয়ে আনন্দ করতে পারছে না আর কেউ।

ডি-আই রুলে দর বেঁধে দেয়া হ'ল। এক ফর্দ জারি হ'ল বাজারের ইজারাদার মহাদেব মোড়লের সেরেস্তায়।

মোতায়েন হ'ল বেকার উকিল—মোক্তার ভলানটিয়র! মধ্যবিত্তের জিভ সড়-সড় করে উঠল।

পাঁচ সেরের উর্ধ্বে বড় মাছের সের আস্ত আঠারো আনা, কাটা এক টাকা। তিন সের পর্যন্ত আস্ত চৌদ্দ আনা, কাটা বারো আনা। ছোট পোনা, বাটা, পুঁটি, খয়রা, মুরোলা, গাগর, পাবদা, বাচা, শোল, ট্যাংরা, শিং আট আনা সের। মাগুর-কৈ বারো আনা, ইলিশ এক টাকা। ডিম এক আনা একটা। তরকারির দর আরো দড়। সব সের দিয়ে বাঁধা। পাকা কুমড়ো ছ'পয়সা, চালকুমড়ো তিন। পটল তিন আনা, বেগুন দুই, দুঁদুল ঝিঙে এক, পেঁপে ছ'পয়সা, ঢেঁরস দশ। কাঁচকলা মুলো এক পয়সা একটা করে। কচুর সের দু-আনা, রাঙা আলু তিন, গোল আলু আট। আদা পেঁয়াজ কাঁচা লঙ্কারও ঐ আট আনা সের। কপির দর ইঞ্চি মেপে, এমুড়ো থেকে ওমুড়ো। ফিতে আছে ভলানটিয়রদের হাতে। কোন ধার থেকে মাপব? বড় ধার থেকে না ছোট ধার থেকে? ছোট ধার থেকে। হুমকে ওঠে ভলানটিয়র।

'পাঁই ফল বেচছ কত করে?'

'আট আনা সের।'

'কী সর্বনাশ! ফর্দে দর বাঁধা চার আনা। ধরো, ডি-আই রুলে চালান দিয়ে দাও।'

'এ দর না পেলে তেল-নুন কিনব কি করে? পাঁইফল বিচেই তো দিন গুজরাই।'

উ-সব ধানাইপানাই কোর্টে গিয়ে হবে। ধরো উ মাগীকে। ঢাকি আটকাও।

'তুমি কী বিচছ বাছা? হিঞ্চে-কলমি? কি ভাবে বিচছ?'

'ভাগা করে বিচছি বাবা।'

কী সর্বনাশ! সেরে বেচতে হবে। সের ছ'পয়সা করে।

'কি করে তা'লে পোষায় মাশায়? ই বিচে তো প্যাটের ভাত জোটাতে হবে।'

'মাগী আবার ল্যাই করছে। থানায় বেঁধে নিয়ে চল।'

'তোমার ডালাতে কী?'

'ক'টি কাঁচা তেঁতুল বাবা।'

কী সর্বনাশ! গুণে বেচছ? দর বাঁধা ছ'পয়সা সের। পাকিয়ে আনতে পারলে তিন আনা হত।

'ধরোনা বাবা, ও পেকেই আছে। কাঁচ-পাকা সব চোখের ভেরম।'

এ মাগী আবার ভাগবত আওড়াচ্ছে। টেনে নিয়ে চল।

ত্রিভঙ্গ চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিল। না, পেবাতিরা আসেনি। পেবাতিরা আর আসে না। সেই দিন থেকেই আসে না।

চটপট কতগুলি জেল-জরিমানা হয়ে গেল। সাপ-বাঘ ওলা-শেতলা শুনেছে, এবার শুনতে লাগল ডি-আই রুলের নাম। একটা প্রচণ্ড আতঙ্ক। পষ্টাপষ্টি বোঝে না, খিদের জ্বালায় পেটের খোল খালি—এখন ভয়ের ঠেলায় হাত-পা

সেঁধোচ্ছে সেই খোলের মধ্যে। সবাই বলছে, কলির পেথম সনজে।

দেখতে দেখতে বাজার পড়ে গেল। জিনিসের আর আমদানি নেই। নিকিরিরা গৃহস্থের দোরে-দোরে লুকিয়ে-লুকিয়ে ফিরি করে। বাজারে গিয়ে কে ব্যাজারে পড়বে? নাকাল হবে পুলিশের হায়রানিতে? হয় উপোস নয় জেল, দুদিকেই লোকসান—কে যাবে ঐ নিঘ্ঘাত মরণের দুয়োরে? তার চেয়ে তোমাদের এই খিড়কির দুয়োরই আমাদের ভাল। কী করবো বলো, এক ঠিঁয়ে বসে আরাম করে দুটো বেচাকেনা করব, সি আমাদের অদেষ্টে নেই। মাথায় করে বোঝা নিয়ে ঘুরতে হচ্ছে দোরে-দোরে হন্তের মত, ফেরারী আসামীর মত। দেশের রীতনীত সব বদলে গেল মাশাই।

তা তো গেল, কিন্তু মহাদেবের উপায় হবে কি? বাজারে মাল মন্দা হলে তার চলবে কি করে? তার তোলা-খাজনা আসবে কোত্থেকে? তার কিস্তির খাজনা শুধবে কি দিয়ে? কোথায় যাবে তার নিট মুনাফার আশাভরসা?

কর্তাদের গিয়ে ধরলো মহাদেব। নিজের কথাটি সরাসরি বললে না; ঘুরিয়ে বললে। বললে, 'বাজার উঠে গেলে লোকে খাবে কি? ভাল করতে যাওয়া হল, ফল হল উলটো। সস্তায় জিনিস পাবে কোথায়, এখন একেবারে নাচার।'

কনট্রোল উঠে যাক, একথা বলতে পারে না মহাদেব।

বললে, নিকিরিদের ধরে বেঁধে নিয়ে আসুন বাজারে। আমার তোলা-খাজনা যে মারা যাচ্ছে। আমি খাব কি ?

কী করতে হবে না হবে কর্তাদের বুদ্ধি দিতে হবে না।

অলিতে-গলিতে ঘুরে বেড়াতে লাগল ভলানটিয়ররা। যদি দেখ কোথাও বিক্রিবেসাত নিয়ে বসেছে অমনি পাকড়াও করে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে আসবে বাজারে। কনট্রোল দরে মাল বিক্রি করিয়ে পরে ডি-আই রুলে সোপর্দ করব। নইলে বেটারা টিট হবে না।

কোন দিক দিয়ে পালাবে চাঁদেরা ? তুই দাঁড়া চাঁপাতলার মোড়ে, আপনি যান কালী পুষ্করিণীর ধারটায়, আমি যাচ্ছি মনসাতলার সাইডে।

থানার দিকে পুলিশ আছে। দেখি ফাঁদে এবার আটকায় কিনা ঘুঘুরা। লাভ হল কী ? আধা পথ থেকে সবাই পালিয়ে গেল। বাজার পড়ে রইল নিঝঝুমের মত। অজ্ঞান-অচেতনের মত।

কি হতে কী হয়ে গেল।

কিন্তু এখন মহাদেব করে কি।

মহাদেব কী করে না-করে, জমিদার তার বিরুদ্ধে বাকি খাজনার জন্যে নালিশ ঠুকে দিলে। কিস্তি খেলাপ পড়েছে তার। এক কিস্তি খেলাপ হলে সমুদয় টাকা একমুষ্টে আদায় হবার চুক্তি।

বিচারটা একবার দেখ। বাজারে মাল আসে না, গৈ-গাঁ

থেকে নিকিরিরা সব ফেরার হয়ে গেল, মরতে মর তুই ইজারাদার। বলি, ইজারা নিয়েছি কেন? তোলা-খাজনা পাব বলে। যদি সেই তোলা-খাজনাই না পাই রাজার পাওনা মেটাই কি দিয়ে? একটা বিধি-ব্যবস্থা তো দেখতে হবে। শুধু-শুধু আইনি-বে-আইনি জুলুম করলেই তো চলবে না।

নায়েবের দরবারে হাজির হল মহাদেব। বললে, 'তোলা-খাজনা আদায় নেই, রাজস্ব দিই কি করে? বাকি খাজনা রেয়াৎ না দিন কমি করে দিন।'

'তা হয় না। যা চুক্তি তাই প্রবল থাকবে।' নায়েবের গলা গুমগুমিয়ে উঠল।

'অন্যায় বললে চলবে কেন হুজুর? বাজারে তবে মাল আনাবার বন্দোবস্ত করুন। তোলার থেকে আমার ওজকার, সেই তোলাই যদি বন্ধ হয় তবে আমি কমনে টাকা পাব?'

'সে সব আমরা জানি না। আমাদের জানবার কথা নয়। তোমার তোলা আদায় হয় কি না হয় তা তুমি বুঝবে। তুমি চোখ-কান খোলা রেখে শর্ত করেছ। কনট্রোল আমরা বসাইনি। মানুষের দশ দশা, কখন হাতী কখন মশা। অদেষ্টের লেখনে হাতী হতে গিয়ে যদি মশা হও তো আমাদের দুষো না।'

'কিন্তু বিচার-বিবেচনা তো আছে মানুষের। আইনে না পাই ন্যায়ে তো পাব। একটু দেখুন না কেন বুঝেসুঝে। বাজার যদি উঠে যায় আমিও তো উঠে গেলাম। বাজার বুঝে

কেন কমি করে নেবেন না ? কনট্রোল বসার পর আমি ফের কমি করে নিইনি আমার তোলা-খাজনা ?'

'ছাড়ছুড় নেই। মিটমাট নেই। ফটকা খেলেছ বাজার নিয়ে। এখন আক্কেল-সেলামি দিতে হবে না ?'

'তবে বাজার আমি ইস্তফা দিচ্ছি।' মহাদেব লাফিয়ে উঠল।

'ইস্তফাই দাও আর যাই দাও, চুক্তির টাকা দিয়ে যাও চুকিয়ে। র-ঠ করলে চলবে না। বিক্রি-পাটার কমিতে কিস্তির খাজনা দিতে ওজর-আপত্তি করতে পারবে না—এই মর্মে সম্পাদন করেছ কবুলতি। মনে নেই ? দেখবে একবার দলিলখানা ?'

'ধম্ম দেখে লোব।' হুমকে উঠে বেরিয়ে গেল মহাদেব।

বাইরে এসে হঠাৎ তার মনে হল, সে বড় একা। সে ঘাটেও নেই, ঘরেও নেই। জাতেও নেই, বেজাতেও নেই। সে মাঝখানে। সে মাঝলা বেনে। সে একজনের থেকে নিয়ে আরেকজনের থেকে খায়। সে উপর-পড়া। সে দলছাড়া। •

না, আবার জাত বদলাবে মহাদেব। ঝাঁকের কই ঝাঁকে গিয়ে মিশবে।

কর্তারা এবার গাঁয়ের মধ্যে গিয়ে ঢুকেছে। এ বেগুন ক্ষেত কার ? বাজারে নিয়ে না যাবি তো বোঁটা ছিঁড়ে-ছিঁড়ে আমরাই নিয়ে যাব বস্তা করে। আমরাই বেচব বাঁধা দরে।

এ-ও পাবি না হে-ও পাবি না। কার এই মুলো? এই সিমের লতা?

না, না, হুজুর, আমরাই লিয়ে যাচ্ছি বাজারে।

চলো এবার জেলোপাড়ায়। ওদের জাল আটকাই।

ধরে নিয়ে যাব তোমাদের জাল। মাছ ধরতে যখন বেরোও না আর, কী হবে তোমাদের জাল দিয়ে? ও জঞ্জাল পুড়িয়ে দেয়াই ভাল।

'মাছ ধরি না হুজুর, জাল ছিঁড়ে যেয়েছে। সুতো পাই না কনটোলে।'

ঠিকই তো। ছেঁড়া জাল দিয়ে কোনো কাজে লাগবে না। ওগুলো দিয়ে দাও তবে পুলিশের হাতে। সুতোর জন্য যখন এত পিত্যেশ, এবার তবে তাঁতের লাইসেন নাও। কই হে জমাদার।

না না হুজুর, এবার ঠিক মাছ ধরব। লিয়ে যাব বাজারে। বাঁধা দরের এতটকু ইদিক-উদিক হবে না।

অন্য রাস্তা দিয়ে গোপে-চুপে মহাদেব এসে হাজির।

'কেউ যাবি না বাজারে। কেউ মাল বিচবি না। এ জুলুমবাজির শোধ তুলব আমরা।'

সবাই হতভম্ব হয়ে গেল। মহাদেব বলছে এ কথা? বাজারের থেকে যার তোলা-খাজনা সেই বলছে বাজার বন্ধ করে দিতে?

'হ্যাঁ, আমিই বলছি। জাত বদলেছি আমি। চলে এসেছি তোদের দলে, আমার নিজের জায়গায়। আমরা একগুষ্টি, আমরা ই-উর জাতজ্ঞাত—কি বলিস রাখাল? আমাদের এক স্বার্থ, এক দিকে ঝোঁকতা—কি বলিস গুপী? আমাদের দুয়ের উপরে আরেকজন জুলুমদার আছে। সেই মেলালছে আমাদের। ডুবি-ভাসি, সব আমরা একসঙ্গে। এক খেয়ার জল আমরা। তুমি কী বলো হে গোষ্ঠ মাৎবর?'

ঠিক বলি। কেউ যাব না আমরা বাজারে।

কেউ যাব না। জমিদারের এ বাজার আমরা উঠিয়ে দেব। মানব না এই কনটোলের বাঁধাবাঁধি। চাল-ডাল, তেল-নুন, কাপড়-গামছার আগুন দাম, আমাদের জিনিসের দামই ঠাণ্ডা রাখতে হবে। যেন আমাদের কখুনু চাল-ডাল, তেল-নুন, কাপড়-গামছা কিনতে হবে না। দুধ বিচে আমাদের জল কিনে খেতে হবে। সইব না এ জবরদস্তি। ইজারাদার যখন আমাদের দলে, তখন আর আমাদের কিছু ভাবনা নেই।

সবাই লহর দিয়ে উঠল। কেউ যাব না আমরা বাজারে। যার আমাদেকে টানবার কথা, তাকেই যখন আমরা টানতে পেরেছি, তখন ডঙ্কা মেরে দিয়েছি আমরা। ও বাজার আমরা নস্যাৎ করে দেব। আমরা নতুন বাজার করব। নতুন দিনের নতুন প্রাণের বাজার। আমাদের এক মাঠ, এক ক্ষেত। আমরা এক ক্ষেতের খেতোয়াল।

তবু পুরোনো বাজারে কেউ-কেউ বুঝি আসে। যাদের না আসলেই নয়। যাদের ঘরে এক মুঠো বাড়তি অন্নের সংস্থান নেই। যারা একেবারেই আজেবাজে।

তবু বলে: 'আমরা কি অমুনি আসি? আমাদের ধরে-বেঁধে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে আসে। আমরা দুব্বল কিনা, তাই পারে আমাদের সঙ্গে।'

একটি-দুটি করে গুটি-গুটি আরো আসে নকি কেউ?

কতদিন বাড়িব খেয়ে বসে-শুয়ে থাকতে পারা যায়? কতক লুকিয়ে-চুরিয়ে, কতক খোলা বাজারে এমনি করেই বেচতে হবে আমাদের। কতক দবে, কতক বে-দরে।

ওকি? ওবা পাইকার না?

চৌপরদিন বাজারে বসে বিচতে পারি না মাশাই। জন খাটতে হয়। তাই খালাস হই পাইকারকে বেচে দিয়ে। দর-বেদর পাইকার বুঝুক।

না, অসম্ভব। নিজেদের দলে বিশ্বঘাতী ঢুকেছে। খেপে উঠল মোটা-বিক্রীর নিকিরিরা।

বাজারে তারা আগুন লাগিয়ে দিলে।

আগুনের উর্ধ্ব শিখাটা মহাদেব দেখল তার বাড়ি থেকে। একটা দমিত জাতির মিলিত ক্রোধ কতদূর পর্যন্ত উঠতে পারে আকাশে, তাই দেখে-দেখে চোখে তার ঘোর লাগল।

আগুন যখন লাগল তখন নিভলও এক সময়।

নেকড়ে বাঘের মত পুলিশ ঝাঁপিয়ে পড়ল গ্রাম-ঘরের

মধ্যে। অনেককে গ্রেপ্তার করলে সন্দেহ করে। মহাদেবকে কেউ সন্দেহ করলে না। নিজের ইজারা নিজে নষ্ট করবে, এ অসম্ভব।

পোড়া বাজারের এলাকা ছাড়িয়ে আনাচে কানাচে আবার বাজার জমে উঠতে লাগল আস্তে আস্তে। ও কি? আবার আসছে ওরা? এরি মধ্যে?

'আসবে না কেনে? কনটোল যে তুলে দিয়েছে।' বললে ত্রিভঙ্গ।

'আসবে? তবু আসবে? আমার বাজার পুড়ে গেল, তবু আসবে? এখনো ঠেকানো যায় না?' মহাদেব অস্থিরের মত আগু-পিছু করতে লাগল: 'কিন্তু উ কে?'

নজর করে দেখল, পেবাতি। এতদিন আসেনি, আজ এসেছে। বাজারের সঙ্গে মহাদেবদের সম্বন্ধ উঠে যাবার পর এসেছে। বসেছে তেমনি এক ঝুড়ি আনাজ নিয়ে।

'উ সেই মেয়েটা না? দূর থেকে ভাল নজর পাচ্ছি না নাকি?'

'কুন মেয়েটা?' ত্রিভঙ্গ দেখেও দেখল না।

'যার সঙ্গে রঙ করেছিলি তুই—'

'কার সঙ্গে আবার রঙ করলাম!'

'চুপ! দাইয়ের কাছে তুই পেট লুকাস না।' ধমক দিয়ে উঠল মহাদেব, 'আমার চোখকে তুই ফাঁকি দিবি? তু থাকিস ডালে আমি থাকি পাতায়।'

ত্রিভঙ্গ চুপ করে রইল।

'উ যদি তুর সেই রঙের লোক হয়, আটকা ওকে, যেতে দিস না, বসতে দিস না বাজারে। যা, ধরে লিয়ে আয়।' মহাদেব ত্রিভঙ্গকে ঠেলে দিল সামনে।

'কোথায় লিয়ে আসব?' ত্রিভঙ্গ থম্বার মত দাঁড়িয়ে রইল।

'কোথায় লিয়ে আসবি? তাও আমাকে বলে দিতে হবে? কেনে তুর ঘর-বাড়ি নাই? ঘরে খাবার ব্যবস্থা নাই? মাথার উপরে আমি নাই তুর? তুর নিজের লোককে তু বাজারে বসে শাকপাতা বিচতে দিবি? তুর ধম্ম নাই? মায়া দয়া নাই?'

'কিন্তু জাত—' গলার কাছটায় আটকে গেল ত্রিভঙ্গর।

'জাত? সব গেছে আমাদের। জাতও গেছে। আবার ওদের সঙ্গে গিয়ে মিশেছি। যা, ডেকে নিয়ে আয় মেয়েটাকে। রঙের মানুষের মনে দুখ দিতে হয় না। এ তো দুষ্ট খিদে নয়, এ রঙ। যা, ডেকে নিয়ে আয়। লক্ষ্মীর পাঁজ পড়ুক সংসারে।'

পেবাতি অলক্ষ্যে একবার এদিকে মুখ ফেরাল। নতুন রোদ পড়ল তার মুখের উপর। মেটে সিঁদুর মাখা সিঁথেটা জ্বলজ্বল করে উঠল।

মাটির দিকে চোখ নামিয়ে ত্রিভঙ্গ বললো, 'উর আর কারো সঙ্গে সাঙা হয়ে যেয়েছে বাবা।'



চিকিৎসায় ক্ষেমা দিলে। অসুখ যখন বারণ হয় না তখন আর মিছিমিছি খরচ করে লাভ কী ?

যে বাঁচবার সে অল্প-সামান্যতেই বাঁচে। এতদিন ধরে লটপটানি করেনা। আর পারিনা। এমন-তেমন হয়তো হবে। করা যাবে কী! অনেক করেছি। দশ জনেও বলছে, অনেক করেছি! তবে আর কি। হাতে আর এখন পয়সা নেই। হাতে আবার টাকা হয়, তখন নাহয় আরেক পালা দেখা যাবে। তিন মাস হালুটি করি, নয় মাস সংসারী করি। এখন এই সংসারী মাসে টাকা কই ? ঘরের মজুতী চাল তো আর এখন বেচা যায় না। ফসলের মুখে ধানের দাম কম এখন।

'বাপ কেমন আছে ?'

'গ্যালেই পারে এহন। বোধভাষ্য কিছু নাই। চক্ষু বুজিয়া পড়িয়া আছে।'

'হেকিম-ফকিরে কয় কী।'

'কয় মোর মাথা। কপালদণ্ড মোর। ক্যাবল টাহার ছয়লাপ।'

সঙ্গীন রুগী, অথচ টালবাহানা করছে। ধর্মকথা শুনে তাড়াতাড়ি কেটে পড়ছেনা। চুপিচুপি একদিন দেব নাকি বুড়োর টুঁটি টিপে।

না, শেষ পর্যন্ত মরল সবদর খাঁ। বাঁচল বিল্লাত খাঁ।

এবার আর কি। ওয়ারিশি জমি পেলে ছ কানি। বাঁধাবন্ধক নেই, প্রজাপত্তন নেই, একেবারে নিজ চাষে। বাড়ির দরজায় জমি। ইচ্ছে করলে খাসে রাখ, ইচ্ছে করলে প্রজা ধরাও। দরেবস্ত হকহকুক সব তোমার।

ও, হ্যাঁ, বোন আছে বটে একটা। ফারাজ অনুসারে অংশ পায়। অবস্থা খুব বেশি না হলেও একেবারে অল্প না। জায়জমিতে এসে যে অংশ ধরবে এমন মনে হয় না। আর ধরতে এলেই বা কি। বাপকে দিয়ে নিজের পরিবারের নামে আগে-ভাগেই এক দান পত্র করে রেখেছে। হেবা-বিল-এওয়াজ। এক ছড়া তসবী আর একখানা জায়নামাজের বদলে। ব্যামোপীড়ায় পুতের বৌই তত্ত্বতাউৎ করেছে, উঁকি মারতেও আসেনি একবার মেয়ে। মেয়ে তো পরের ঘরের পরচালা। আর পুতের বৌ নিজের ঘরের টুই।

বাংলা দলিল নয়। রেজিস্টারি করে নিয়েছে বিল্লাত খাঁ।

বোনের খসমের সঙ্গে হৃদ্দ নেই তার। কে জানে কখন কি বাগড়া দেয়! বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা। মোকদ্দমায় ছুঁলে আটান্ন।

এবার আর কি। বাপ ফৌত হয়েছে। ওয়ারিশি পেয়েছে। জমিদারের সেরেস্তায় নাম. খারিজ করে নিয়েছে একলার। নামের পিছে গং বসেনি। গয়রহ নয়, একলা

তোমার জমা। তোমার বিত্তবিভব। তোমাকে আর পায় কে।

বাপ মরেছে, এবার একদিন দেশবাসীকে খাওয়াও। জেফৎ দাও। ধম্মকাম কর।

'ঠিকই তো। মাথামুরুব্বিরা ধ্যরছে, খাওয়াইতে লাগে একদিন। না খাওয়াইলে সমাজ বন্দ অইয়া যাইবে।'

জননা সায় দেয়। বলে, 'রেওয়াজরীতি যা আছে হ্যা না মানলে চলপে ক্যান? কিন্তু, পুছ করি, খাওয়াইবা কি?'

'খালি লবণভাত তো খাওয়ান যাইবেনা। দেহি মুরুব্বিরা কি কয়।'

হাতে যা রেস্ত ছিল কবরখরচে বেরিয়ে গেছে। পুঁজি-পাটা কিছু নাই। অল্পকম ধারকর্জ করে চালাতে হবে। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা। গরিবের বাড়িতে হাতির পাড়ার দরকার নাই।

'কি খাঁয়ের পো, দাওয়াৎ দিবা কবে?' জিগগেস করলে জুম্মাবাড়ির মুন্সিসাহেব।

'আহ্যারা দিন-তারিখ ঠিক করিয়া দেন হুজুর। মুই তো দরজায় হাজির।'

'কি-কি খাওয়াইবা, কারে-কারে খাওয়াইবা—হ্যা তো ঠিক করন লাগে।'

'হ্যা তো লাগেই। আহ্যারা বৈঠক লাগান একদিন। বিচার-আচার করিয়া জাহির করেন ফতোয়া!'

হ্যাঁ, মাথামুরুব্বিদের সালিশ ডাকাতে হবে। শল্লা পরামর্শ করে ঠিক করতে হবে কাকে-কাকে নিমন্ত্রণ করা যায়, বেশির ভাগ লোকের কি-কি খাবার ইচ্ছে। দরকার হলে ভোট নিতে হবে। এ একটা সমাজের কাজ। জামাত খাওয়ানো। দেশদেশী রীতনীত অমান্য করার উপায় নাই।

বিয়াসাদির থেকেও এ বড় কাজ, এই শ্রাদ্ধশান্তি। বিয়ার পর খানা না দিলে বিয়া আর ভেস্তে যায় না, কিন্তু বাপ-দাদার মরার পর খানা না দিলে দোজখে-নরকে পুড়তে হবে। পাড়ার মধ্যে বাস চলবে না। জায়গা হবে না জামাতে। নামাজ পড়তে হবে মজিদের বাইরে।

সে কি সম্ভব?

না, না, খানা ঠিক দেবে বিল্লাত খাঁ। কিন্তু তার অবস্থা তো কারু অজানা নয়। একটু মোক্তারি যেন তার পক্ষ হয়ে কেউ করে। একটু কমে-সমে যদি সারা যায়! কী অদিন পড়েছে আজকাল!

সে হবেখন মজলিশে। গাঁয়ের লোক জামাত করে খায় এই একদিনই। এতে অত আপত্তি-নালিশ করলে চলে না। সবদর খাঁর নাম-নিশানা উঁচু ছিল। তার নাম ছোট করে দিলে লোকে বলবে কি! লোকে বলবে, সমর্থ হয়ে বিল্লাত খাঁ বাপের নাম ডুবিয়েছে। গোটা খাঁ বংশের নাম ডুবিয়েছে।

দশের একজন হয়ে থাকতে হবে তো সমাজে! সমাজ বন্ধ হয়ে গেলে আর থাকল কি! ওঠক বনেনা বৈঠক বনেনা

পাড়া বনেনা পার্টি বনেনা, গাঁয়ে থেকে আর তবে লাভ কি! সে জঙ্গলে চলে যাক।

মজলিশ বসল বিল্লাতের বাড়ির খোলায়। হাটবেলার পর বাড়ি ফেরার সময়। বেলা বসবার আগখানে।

খাওয়ার নামে মজলিশ একেবারে গুলজার করে বসল। বোলবলা আছে এমনি সব গ্রাম্য ভদ্রদের দল। জুম্মাবাড়ির মুন্সি সাহেব। মহল্লার চৌকিদার। দরগার খাদেম। মোটা খাজনার তালুকদার। বোর্ডের কেরানি। মোড়ল-মাতব্বর।

আগে ঠিক কর কাকে-কাকে খাওয়াবে।

জামাতের লোক তো বটেই। পার্টির লোক। জ্ঞাতি-গোত্র, ভায়াদ-দায়াদ, এমনকি পাড়াসম্পর্কের কুটুম্ব। এধার ওধার যাদের জমি, সেই সব পাশ-আলের দখলকার। যারা এক পীরের সাগরেদ। ফেরেস্তা করতে বসল মুন্সিসাহেব।

'কিন্তু মাপ করবেন হুজুর এস্তাজ্যারে ডাকতে পারমু না।'

'ক্যান, হ্যা কি ক্যরলে?'

'মোর লগ্গে মামলা চ্যলছে পেটিকোটে। গরু দিয়া মোর ধান খাওয়াইছে।'

'থো, আইজ্ঞ আর কাইজ্জা করেনা। যদি হকে থাকে কত চাউল-ধান ফিরিয়া পাবি।'

'হ্যা মোর ধানও খাইবে, ভাতও খাইবে।'

'খাউক! কত খাইবে! কারডা কেডা খায়?'

'কিন্তু ঐ ধলু হ্যাখেরে ক্যান? অর লেগে মোর আওয়া-যাওয়া নাই।'

'এহন থিয়া আরম্ভ হইবে আওয়া-যাওয়া। ল্যাহ, ধউল্যার নামটুকও লেইখ্যা থোও।'

'কিন্তু ঐ বেজন গাজী?' হুমকে উঠল বিল্লাত খাঁ: 'ও তো দশধারার দাগী।'

'অয় অউক। দাগীরও খাইতে সাধ যায়। প্যাটের মধ্যেও তো দাগ লাইগ্যা আছে—খিদার দাগ। বাপের কামে খাওয়াইবি, হ্যাতে আবার দাগ-বেদাগ কি!'

কিন্তু যাই বল, আমিন সর্দারকে বাদ দিতেই হবে। তার জামাত অনেক আগেই বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

কেন, দোষ কি আমিনের?

নিকা করে নিকাই বিবির বিত্তসম্পত্তি ফাঁকি দিয়ে দলিল করে নিয়েছে। গ্রাম্য পঞ্চায়েতে বিচার করে ঠিক করেছে এরকম জাঁহাবাজ জোচ্চোরকে সমাজ নেবেনা। তবে এখন আবার আমিনের নাম ঢোকাও কেন?

না, দোষ খ'ণ্ডে নিয়েছে আমিন সরদার। গাঁয়ের লোককে শাহী একটা ভোজ দেবার চুক্তিতে। সে চুক্তির জামিন হয়েছেন স্বয়ং মুন্সি সাহেব।

'ল্যাহ তবে ঐ আমিন সর্দারের নামটুক।'

আর কত লিখবে? শস্তাগণ্ডার বাজার নয় আজকাল। রাজ্যভোর লোক ধরলে চলে কি করে? আর ওরা তো সব

বাজে লোক। বেপাড়া-বেপার্টির লোক। ওরা কারা? ওদের সঙ্গে আমার একটা বোলানিয়া সম্পর্কও নাই। ডাকলে উত্তর দেয় এর বেশি সম্বন্ধ নাই ওদের সঙ্গে। আবার ওদের কেন? ওদের সঙ্গে আমার মিল-মিলাত নাই, ওদের সঙ্গে আমার বেজার-বিরুদ্ধ—ওদের ডাকতে মন ওঠেনা। কিন্তু কিছু বলতে পারেনা অসাহসে। এ বিষয় বিল্লাতের কোনো স্বাধীন মত-অমত নাই। সমাজ যা বলে দেবে তাতেই সে হেঁটমুণ্ড। এ সমাজের এলেকা। সমাজের এক্তিয়ার। কথাকার্য সমস্ত সমাজের।

বাতকে বাত দু একটা কথা তবু কইছে বিল্লাত। ভয়ে-ভয়ে কইছে। যখন ভাবছে তার ভিতরের কথা, ভবিষ্যতের কথা। তার ঘর-গৃহস্থির কথা।

কিন্তু তার অবস্থার কথা খুঁটিয়ে তলিয়ে দেখবার সময় কই সালিশ সাহেবদের? কেউ তার বান্ধব নয়। কেউই তার হিতমঙ্গল দেখতে আসেনি।

আবার নিজেকে তখুনি প্রবোধ দেয় বিল্লাত। কত বড় নাম পড়ে যাবে দেশে-গাঁয়ে। বাপের কামে সেই সন যা খাইয়েছিল বিল্লাত খাঁ! এমন আমরা বাপের আমলেও দেখি নাই! বলবে সবাই। কথাটা মনে-মনে শুনতেও কেমন ভাল লাগবে।

এবার ঠিক কয়ো পাক হবে কোন-কোন পদ—

'পোলাও-গোস্ত তো নিচ্চয়—'

সব পান্তা-লঙ্কার লোক, জিভ এখন একেবারে লেলিয়ে দিয়েছে। দেখ একবার নমুনাটা। ঝটকা মেরে উঠল বিল্লাত খাঁ।

'পাটশাক আর চুনা মাছের খাটা খামু নাকি তবে?' কে একজন পালটা ঝঙ্কার দিলে।

মুন্সি গম্ভীরমুখে বললে, 'ছমাসে-নমাসে কারবার। বালোমন্দ দুইডা খাইতে চাইবেই তো হগলে। বালো খাওয়ালেই তো কুদরং। বালো খাওয়াইলেই বালো কাম।'

বিল্লাতালি চুপ করে রইল।

'একটি ডাইল করন লাগে। বুড়ের ডাইল।'

'আর মাছ? চুনা-ইচায় চ্যলবেনা কইলাম। বোয়াল-কোড়াল চাই। গোস্ত—খাসির গোস্ত।'

'আর পুদিনা পাতার চাটনি।'

'শ্যাষকালে দই আর রসগোল্লা।'

এর নিচে আর নামা যায় না। এ একেবারে কম-সম হিসাব। শেষকালে দই আর রসগোল্লাটাই আসল। মইষের দুধের দই। হাঁড়ি ওলটালে পড়েনা তো বটেই, ফাট-চেড় ধরেনা। আর রসগোল্লা চাই 'বড়-বড় মুখভর।' মুখে বেখে অনেকক্ষণ যাতে চিবোনো চলে।

একটু গাঁইগুঁই করতে যাচ্ছিল বুঝি বিল্লাত খাঁ। গুড়ের উপর জিভে যাদের সোয়াদ নেই তাদের আজ দই রসগোল্লা!

সোয়াদ নেই বলেই তো খেতে চায় অমনি পোশাকী জিনিস। তবে আর জেফৎ দিয়ে লাভ কি ?

যে জেফৎ দেবে সে ঠিক করতে পারবেনা আকার-প্রকার। যারা খাবে তারাই ঠিক করবে। এই সমাজের চলতা নিয়ম। মাঠের উপর চলতা-পথ দিয়ে যেমন তুমি হাঁটো তেমনি দেশ-গাঁয়ের এই চলতা নিয়ম ধরে তোমাকে চলতে হবে।

দিন-তারিখ এবার ঠিক করে দিন।

'লোক তো অইল পেরায় তিন চারশো। টাকা কত লাগপে পছন্দ করেন ?' ম্লানমুখে জিগগেস করলে বিল্লাত।

'যা লাগনের হ্যা লাগপেই। হ্যার লিগা ঠ্যাকপেনা। যদি টাকা কবলাও কম, খাওনে হেইলে খ্যান্ত দাও। বোজছ ?'

না, না সাধ্যমত খরচ করবে বৈকি। সামাজিক কাজে সে অশ্রদ্ধা করতে পারেনা।

'হ, বুইজো, যদি সাধ্যের খাওন না হয়, সমাজরে চটাইবা তুমি, বেনালে পড়বা।'

'সাধ্যের খাওন' অর্থ খাওয়ানোতে অসাধ্যসাধন। কিন্তু উপায় নাই। চটানো যাবেনা সমাজকে।

'এত ত্যাল-চিনি-ময়দা পামু কই ?'

'ক্যান, ফুড কমিটির সেক্রেটারি নাই ? এমুন ব্যাপারে পেশাল পারমিট কাটান যাইবে। হ্যার মন-গতি বালো।'

ফুড কমিটির সেক্রেটারি কে? এ তো এক নম্বর ইউনিয়ন। এক নম্বরে কে পড়েছে?

সকলে চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল।

না, ভয় নেই। তেমন কেউ নয়। আমাদেরই জাতগুষ্টি। হবিবর রহমান।

'বলিয়া-কইয়া দিমু আমি ঠিকঠাক করিয়া।' চোখ টিপল বোর্ডের কেরানি। 'বোজলানা, একটু টিপন-টাপন লাগপে।'

বিল্লাত খাঁ চলেছে ফুড কমিটির সেক্রেটারির সন্ধানে। অফিসে নয়, বাড়িতে। তার অর্থ বার-বাড়িতে নয় ভেতর-বাড়ির নিরিবিলিতে। মগরবের নামাজের পর। অপকামের ফিকিরে।

'হগলডি হুনছি মুই। কোন-কোন মাল চাই?'

কটু তেল, শাদা চিনি আর ফিনফিনে ময়দা। ত্যানারা ফিরনি-পায়েস খাইবেন, বাড়িতে ভিয়ান বসাইয়া রসগোল্লা বানাইবেন। হ-হ, মোগো ময়রা—বরগুনা বন্দরের ছিপাৎ উল্লা।

তাতো খাইবেই। সবদর খাঁর নাম-ডাক কেমন, তা দেখতে হবে তো। বাপের নাম তো আর মুছে দেয়া যাবেনা।

'হ্যা মুই সব দিতে পারমু। টিন-বস্তা হগল মজুত আছে। কিন্তু দাম দিবা ক্যামনে?'

'হিসাবে কি কয়?'

'কলম কাগজ ধরলে হ্যা একটা অইবেই।'

'নগদ টাকা পামু কই? ঘরে চাউল থুইছি বাইন্ধা, হ্যাই দিমু আর কি। সম্পত্তি লইয়া লাড়াচাড়া করমুনা।'

'হ্যাই বালো, চাউলই বালো। টাহার দাম কমে কিন্তু মালের দাম বাড়ে। চাউলই দিও। উধ্ব´ দামে বেচিয়া দিমু সময় অইলে। তোমার লগে দামের হিসাব কিন্তু অহনকার বাজার দর।'

খোরাকির উপরে মণ দশেক বালাম চাল মজুত করেছিল বিল্লাত খাঁ। সময় বুঝে উধ্ব´ দামে বেচবে বলে। সে দশমণই সেক্রেটারি আদায় করলে। মেজবানির বাকি খরচের জন্যে এখন খোরাকির চালে হাত দাও।

'এ তো তোমার সুবিস্তাই অইল। ঘরের জিনিস দিয়াই হারতে পারলা। নগদ টাকা কর্জ করতে অইল না।'

কিন্তু ঘি? খাসি? ডাইল-তরকারি? মশল্লা?

'আরে খ্যাড় আর বাখারি যহন জোগাড় অইছে তহন দড়িও জোগাড় অইবে। যাও, পাকা হাতে ঘর ছাদন কর এইবার।'

'অন্যেরে খাওয়াইতে গিয়া নিজের কপাল খামু।' পরিবারের কাছে আপশোষ করে বিল্লাত খাঁ: 'ভাতের দুঃখে মরমু এইবার।'

'অন্যেরে খাওয়াইলে কি মরে? যে খাওয়ায় হ্যারে আল্লা আবার খাওয়ায়।' সরল মুখে বলে সোনাবান।

চাল দিয়ে এল ফুড কমিটির সেক্রেটারির বাড়িতে। নিজের ঘাড়ে করে। মজুরি বাঁচিয়ে।

যে দুচার পয়সা বাঁচে। বস্তার ভারে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিল্লাত। মড়ার দাড়ি কামিয়ে সে ভার কমায়।

'খোঁজ-তল্লাস পাইছি মোরা। কিন্তু মোগো কি দোষ কন?'

কে তোমরা?

আমরা ফকির-মিচকিন অন্ধ-আতুর এতিম-তছির রাহী-মুসাফেরের দল। হুজুরের মেজবানিতে আমাদের ডাক পড়ল না?

না, এ জুলুমদার সমাজের নিমন্ত্রণ। এ আইনের ব্যাপার, অন্তরের ব্যাপার নয়। এখানে তোদের জায়গা নেই। তোদের জন্যে ভিক্ষা, দাওয়াত নয়।

তোরা ফিরে যা।

কটু তেল এল, ময়দাও এল কিছু বস্তা-পচা—কিন্তু চিনি কই?

সেক্রেটারি খবর পাঠাল 'ইস্টকে' চিনি নাই। যা অল্প-সামান্য ছিল বেরিয়ে গেছে। বড় দাঁও এসেছিল একটা আচমকা। লোভ সামলানো লাট বেলাটের পক্ষেও কঠিন ছিল।

'এক কাজ কর। 'রসগোল্লা বন্ধ করিয়া দাও।'

'হ্যা দেওন যাইবে। কিন্তু চিনির বাবদ যেডি চাউল দিছি হেডি ফেরস্ত দেন। চাউল না দেন নগদ দেন।'

'রাখ, রাখ, বুজিয়া-সুজিয়া কতা কইয়ো মিয়া। কেডা তোমার চাউল নিছে?'

দশ দিকে আঁধার দেখল বিল্লাত খাঁ। টলতে-টলতে বসে পড়ল।

এখন উপায়? নলিশ-আর্জি করতে হবে নাকি?

সবাই বললে, নালিশ নেবেনা আদালত। কালাবাজারে চোরাকারবার করতে গিয়েছিলি, তার আবার নালিশ-ফয়সালা কি? রোকা-রসিদ নাই, টিপছাপ নাই, মোকাবিলা সাক্ষী নাই—ও চেপে যাওয়াই ভালো। নিজেদের মধ্যে দ্বেষরাগ এনে লাভ কি? খেলে খেয়েছে, জাতভাইই তো খেয়েছে।

'তবে রসগোল্লা বন্ধ করিয়া দি।'

ও সর্বনাশ! রসগোল্লা বন্ধ হলে তো সবই বন্ধ হল। ঝাল-লবণ খেতে কে আসবে কষ্ট করে? বেশ, দাও তবে সব বন্ধ করে। দাওয়াত বন্ধ। জামাত বন্ধ। সমাজ বন্ধ।

রসগোল্লা তা হলে বাজারের বাসিন্দে মোদকের থেকে কিনতে হয় বায়না দিয়ে।

উপায় নেই। কপালদণ্ডে বাড়িতে বসে নিজের জাতের কারিগর দিয়ে যখন জিনিস হলনা তখন বাজারের থেকেই আনতে হবে। ঠেকাঠেকির সময় জাতধর্ম দেখলে চলে কি করে?

'বালোই অইল। মাল হেইলে বালোই অইবে। গোল্লাই অইবেনা, রসও অইবে। একেকজনে খাওন যাইবে আট দশটা করিয়া।'

ময়রা বিধু দাস। হ্যাঁ, জোগান দিতে পারব রসগোল্লা। কিন্তু ধারে-কর্জে চলবেনা। তোমারও নগদ ফেলতে হবে গরম-গরম গোল-গোল। আগাম দিতে হবে বায়না। অন্তত চার আনা।

কিন্তু হাতে যে একটা আধলাও নাই! উপায়?

টাকা কর্জ করা ছাড়া উপায় কি?

'হ্যাই করো! আবার দিন আইবে। লাভেমূলে শোধ অইবে কর্জ।' সান্ত্বনা দেয় সোনাবান।

'নিজের খাওনের লিগা কর্জ না, পরের খাওনের লিগা কর্জ!' বিল্লাত খাঁ কাতর চোখে তাকায় একবার পরিবারের দিকে।

'পরেরে খাওয়াইলেই নিজের খাওন পুরা অয়। তুমি কিছু ভাববা না।' সোনাবান দুই চোখ নরম করে তাকায় খসমের দিকে।

বিল্লাত খাঁ চলল কর্জের সন্ধানে।

'কই যাও?'

'যাই অনঙ্গ সার গদিতে।'

'হেয়ানে কি?'

'কিছু টাকা লমু জমি থুইয়া। টাহার বড় ঠ্যাহা। টাহা না অইলে এদিকে রসগোল্লা অয় না।'

তার জন্যে তুমি বেধর্মীর দরবারে যাবে টাকা ধার করতে ? সুদে-আসলে তাকে তুমি মোটা করবে ? আসতে দেবে জমির উপর ? কী সর্বনাশ ! এ কী বলছ বিপরীত কথা ! কেন, দেশদেশী স্বজনবন্ধুর মধ্যে মহাজন নাই ? কেন, জামাল হাজী ? আহম্মদ •মির্ধা ? তারা পারেনা টাকা দিতে ? যদি জমি-জায়গা বন্ধক-উদ্ধারে বিলিয়েই দিতে চাও তবে তাদেরকেই আসতে-বসতে দাও জমির উপর। তা নয়, এ কী বেড়াঁড়া ব্যাপার !

খবরদার, যেওনা ওদিকে।

পথের মুখ ঘুরিয়ে দিল বিল্লাত খাঁর। বিল্লাত চলে এল জামাল হাজীর দরবারে।

এক বুক দাড়ি ভাসিয়ে বেরিয়ে এল হাজীসাহেব।

'টাকা যে নিবা শোধ দিবা ক্যামনে ?'

'হাটঘাট করিয়া শোধ দিমু আস্তে-আস্তে।'

পারবেনা শোধ দিতে। জানতে বাকি নাই হাজী সাহেবের। এক নজর দেখেই সে বুঝতে পারে। তাই বললে, 'ত্যাহ, মোর কাছে রেহান-মরগিজ নাই। একেবারে খাড়া কবালা। যদি কও তো, খোসখরিদ করতে পারি। দু কানি আছে এক কানি দাও। সুদের ধার ধারিনা। সুদ হারামি। বোজছো ?'

তবু রেহান-বন্ধক খুলে জমি ফিরে পাবার আশা থাকত। মেয়েকে শ্বশুরঘরে পাঠিয়ে দিলে যেমন আশা থাকে তার

নাইয়র আসার। কিন্তু এ একেবারে মেয়েকে কবরখোলায় পাঠানো।

কিন্তু উপায় নেই। সমাজের মুখ দেখতে হবে। চালাতে হবে যখন যে রকম ধরতাই। লাইন ছেড়ে দেওয়া চলবে না।

বেকাদায় পেয়েছে হাজীসাহেব। এক কানির দাম দু'শোর বেশি দিতে পারবেনা। কবালায় কিন্তু লিখে দিতে হবে চারশো। কোথা থেকে কোন সরিক বেরিয়ে এসে অগ্রক্রয়ের মামলা করে বসে ঠিক নেই। তাকে ঠেকাবার জন্যে কবালায় পণ বেশি ধরতে হবে। যাতে অত টাকা জমা দিতে না পারে। আর যদি ঠেকানো নাই যায়, মন্দ কি, পণের ডবল পেয়ে যাবে মুনফা।

তাই সই। যা জোটে, দুশো টাকা নিয়েই এক কানি বেচে দেবে বিল্লাত খাঁ। রসগোল্লা খাওয়াবে মেহমানদের।

না, কূট-কপটের ধার ধারবেনা সে। বোনকে দিয়ে অগ্রক্রয়ের মামলা করাবেনা। তার নিজের জমি বোনের খসম-পুত লাঙলে-কোদালে হেঁট-উপুড় করবে তাই বা সে সহ্য করবে কি করে? হাজীসাহেবকে জব্দ করে তার লাভ কি? বাপের এই শুভকামে কাউকে জব্দ করার কথা যেন সে না ভাবে। আল্লার ফজলে এক কানি জমি নিয়েই সে টিঁকে থাকবে কোনোরকমে।

তবু গাঁয়ের পঞ্চজনের কাছে গিয়েছিল বুঝি নালিশ করতে। হাজীসাহেবের নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে।

'হাজীসাহেব যদি কিছু বেশিই নেয়, হ্যাতে আপত্তি করনের আছে কী! মোগো জাতভাই জ্ঞাতকুটুমই তো নিলে। এঘর থিয়া ওঘর। এক জ্যাশ, এক নাম, এক ধম্ম। বিদেশে-বিপাকে চলিয়া গেলেনা। বিড়ালের বাচ্চা বিড়ালেই খাউক, শিয়ালে খায় ক্যান? বোজলানা কতাটা?'

'সাধ্যের খাওয়া' খেল কিনা সবাই কে জানে, বিল্লাতদের খাওয়া অসাধ্য হয়ে উঠল।

শুধু তাই নয়। না-বেচা বাকি এক কানি জমিতে গাজুরি দখল নিতে এল হাজীসাহেব।

বেচলাম এক কানি, দুকানি চাও কোন এক্তিয়ারে? কিসের বনিয়াদে?

এই দেখ কবালা। বহা চারশো টাকা, জমি দুকানি। রেকর্ট-পর্চা সীমানা-নিশানা সব মিল করা। দু কানি বলেই তো চারশো টাকা নিয়েছিলে। কানির নিরিখ ধরেছিলে দুশো টাকা করে। মনে নেই? মনে না পড়ে এই দলিল দেখ। ও, দলিল পড়তে পারনা বুঝি! কিন্তু পড়িয়ে তো শুনিয়েছিল তোমাকে।

প্রথমটা বিল্লাত থম্বা হয়ে বসে রইল ঝিম খেয়ে। পরে গা ঝাড়া দিয়ে উঠল মাথা ঝাঁকিয়ে। বললে, মিথ্যেবাদী, জোচ্চোর, কমজাত—

জোর করে বেদখল করে দিলে হাজী সাহেবকে।

হাজী সাহেব মামলা ঠুকল।

ঠুকুক। প্রথম আপত্তিই পক্ষাভাব। বোনের সরিকি আছে জমিতে—হ্যাঁ, আছে, একশো বার আছে—সেই বোনকে পক্ষ না করার দরুন মোকদ্দমা অচল।

হেবা-বিল-এওয়াজ ছিঁড়ে ফেলবে বিল্লাত খাঁ। শুধু সরিকি অংশ নয়, ষোল আনাই বোনকে দিয়ে দেবে সে। বলবে, বাপ মুখস্থ দান করে গিয়েছে বোনকে মরার অনেক বছর আগেকালে। জমি যে সে দখল করছে, সে শুধু বোনের হয়ে, ভাগ-চাষের সর্তে। বেরনের বদলে ধান পাচ্ছে খোরাকের। হ্যাঁ, বলবে সে শাদা গলায়, সিধে হয়ে, সাক্ষীর জোটপাট করবে। সুতরাং, জমি যদি তার বোনের হয়, কবালা করার স্বত্ব ছিল না বিল্লাত খাঁর। ঐ কবালা তাই ভাক্ত, অসার, অকর্মণ্য। হাজী সাহেব তাই কিছুই কেনেনি। বা, যা কিনেছে তা ফক্কা।

বোনের খসমের সঙ্গে হৃদ নাই বিল্লাতের। না থাক। তবু আজ সইবে বোনের খসম-পুতের চাষবাস। বোনের ছেলেদের মুখগুলি একবার চেষ্টা করল ভাবতে। কচি-কচি নাবালক মুখ। গোঁফ দাড়ি ওঠেনি কারু। অনেক মোলায়েম, অনেক আপনার। হয়তো তার নিজের ছেলেদের চেয়েও আপনার।

'আরে যাও কই খাঁয়ের পো?'

'উকিল সাক্ষাতে। বর্ণনা লেখাব একটা।'

'টন্নি কে?'

'ইমানালি।'

'তা ঠিক আছে। মামলা কিসের?'

'এককানি কিনিয়া জমিতে ল্যাখছে দুইকানি। টাহা দিছে দুই শো, ল্যাখছে চাইর শো। জালবাজিটা ছাহ দেহি।'

'তা তো ছাখতাছি। কিন্তু উকিল কেডা?'

'ভূপেনবাবু। ভূপেন গু।'

কী সর্বনাশ! ওকে উকিল দিচ্ছ কেন? কেন, আমাদের হামিদ সাহেব নাই? আমাদের বরকত মিয়া? তারা কি আইনকানুন বোঝে না? না জানেনা, তদবিরের ফিকিরফন্দি? পথ ঘোরো। আপন ইষ্টকুটুম ধরো। যদি উকিলমুহুরিই খাওয়াতে হয় নিজের জাতজ্ঞাত খাওয়াও। বিদেশীর দরজায় যাও কেন? কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞান লোপ পেল নাকি?

'দাওয়াত যে খাওয়াইছলা হ্যা কি বিদেশী মানুষ না নিজের জ্ঞাতকুটুম? এ ও হ্যাই। দাওয়াত খাওয়ান। ফির, ঠিক লোক ধর গিয়া। মোকদ্দমার হারন-জিতন বেশি কতা না। বোজছো?'

দুজনে ভাগচাষে জমি করছে একবন্দ। পরের জমি।

বিলাস পাল আর বিল্লাতালি।

হাঁড়িতে করে পান্তা এনেছে বিলাস। সঙ্গে একটা

কলা, একটু নুন, একটা পেঁয়াজ, একটা কাঁচালঙ্কা। বিল্লাতালি কিছুই আনতে পারেনি। আনবার আর তার সঙ্গতি নেই। পরকে খাইয়ে ঘুচে গেছে তার নিজের খাওয়া। নিজের জমি ছেড়ে ধরেছে এবার পরের জমি। রায়তি ছেড়ে বর্গাদারি।

গাঁ-দেশে দুষ্ট লোকে কানাঘুষা সুরু করেছে, হিঁদুলোকের জাত মারো। হাঁড়িতে হাত ঢুকিয়ে ভাত পুরে মুখে দাও।

বিল্লাতালি ভাবছে বিলাসের হাঁড়িতে থাবা বসাবে কিনা। খিদেয় আর খাটনিতে পেট তার চোঁ চোঁ করছে। সে দিনকার জিয়াফতে কি-কি খাওয়া ফেলা গিয়েছিল তারই দৃশ্য চোখের উপর ভাসতে লাগল।

'কিছু খাইবা ?' গায়ে পড়ে জিগগেস করলে বিলাস।

'তোমার কম প্যাড়বেনা ?'

'না, কম প্যাড়বে ক্যান ?- নাও, গামছাখান পাতো। অনেক খাটছখুটছ। খাইয়া লও কয় গরস। আরে, খাওয়াইতে জানলেই আবার খাওন আসে কপালে। গামছাখান ছিড়া ? হেইলে এই হাড়ির থিয়াই খাই আইয়ো।'

'তোমার জাত যাইবে না ?' ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল বিল্লাত।

'মোরা কি দুইজাত যে মোগো জাত যাইবে ?'

'মোগো একজাত, এ তুমি ক্যামনে কও ? হুগলডি যে

এত কওন লাগছে হ্যা মিত্যা? রাহ, একডা মানপাতা ছিড়া আনি।'

পাতায় ভাত তুলে দিতে লাগল বিলাস। বলল, 'বিলাস-বিল্লাতালিরা কি দুই জাত? তুমি চাও আমার দিগে, আমি চাই তোমার দিগে। কি মনে অয়? দুই জাত? কি, পঁ্যাজ লাগবে নাকি? নাও, আছে ঐ হাড়ির মধ্যে। দুই জাত নাই আর দুনিয়ায়।'

'না, আছে, তুমি জাননা।' বিল্লাতালির দুই চোখ ঝালে-পেঁয়াজে গরম হয়ে উঠল: 'সংসারে ঐ দুই জাতই আছে। তা হিঁদু-মুছলমান নয়। তা গরিব আর বড়লোক। খাতক আর মহাজন। মক্কেল আর উকিল। প্রজা আর মুনিব। দুব্বল আর জোরোয়ার। মুই বোজছি এত দিনে। এক জাত যে খায়, আরেক জাত যে খাওয়ায়। এক জাত যে মারে আরেক জাত যে মরে। কও তুমি, ঠিক কইনা? একজাতে মোরা, আরেক জাতে হ্যারা। বোঝলানা কাগো কতা কই?'

'দাও, কইলকা দাও তোমার। মোরটা ভাঙ্গিয়া গ্যাছে পথে আইতে।'

'টিকা-তামুক আছে মোর কাছে।'

'মোর কাছে ম্যাজবাত্তি।'

তারপরে দুইজনে এক হুঁকোতে তামাক খায়। এক নিঃস্বতার সমুদ্রে পড়ে একে অন্যের হাত ধরে।

৮



মুচি হ'য়ে শুচি হয়

ভোর হতে না হতেই ঢেঁকির কচকচি সুরু হয়ে গিয়েছে।

'ওগো বউ, 'ওঠ্ কেনে গো, আত পলচে—বিয়ান বেলায় এত ঘুম কিসের? ভদ্দ নোকের বাড়ির কাজ—তাই বুলছি হুঁস পবন করতে হয়—'

সাড়াও নেই, শব্দও নেই।

'কি ঝলখলি হল বল্ দিনি। ও বউ, ওগো, ওঠ্ কেনে গো—'

মাটকোঠার উপর ঘর থেকে বউ সাড়া দিল: 'আত পলো হলো দিন, ফুত্থুর ফুত্থুর সারাদিন। চেল্লাও কেনে? আমি নিত্যি করতে পারব না।'

'কি, কাজ করতে পারবি না? ছোঁড়ার সোয়াগে বড় বাড়বাড়ান্ত হলচে। ওরে ও বিশ্শা—'

পরক্ষণেই গলা নামাল গরব: 'তোমাকে আর কি বুলবো! তুমি তো ঠসা, শুনতে পাওনা। আজ ঝগড়ার চরম হবে।'

ভাবিনীর ভয় করতে লাগল। ঘুম থেকে উঠে দাওয়ার রোদটুকুতে উবু হয়ে বসে সে পায়ের বুড়ো আঙুলের নোখ খুঁটছে। হেই বাবা ঠাকুর, আজকের দিনটা যেন না মাটি হয়—

'কি হল গো বিশুর মা, বিয়ান বেলা কাজিয়ে কিসের?' পাশের বাড়ির সন্তোষ মুচিনী হাজির।

'দেখ দিকি কাণ্ড। ভদ্দরনোকের বাড়ির কাজ, ছুঁড়িকে আজ দেখতে আসবে—কেমন দিনে কেমন কাজ বল দিকিনি। বউ বুলচে, কাজ করতে পারব না। দাঁড়াও, ছুঁড়িকে একবার বিয়ে দিয়ে দিতে পারি, উদিকে আমি জব্দ করবো তবে ছাড়বো। খেটে-খেটে আমার ছরৎ গেল, দ্যাহ গেল। এমন বউ-বেটা নিয়ে কেউ ঘর করতে পারে?'

'চুপ কর, চুপ কর, ঐ দেখ দাওয়ায় কারা এসে বসে আছে।' সন্তোষ মুচিনী সরে এল উঠোনে।

ভাবিনীরও চোখ পড়ল বুঝি। দাওয়ায় সাত-আট জন লোক ঘন হয়ে বসে হাত-ফিরতি করে হুঁকো টানছে। গায়ে জামা, মাথায় গামছার পাগ বাঁধা।

খাটো আঁচল গায়ের উপর আঁটো করে পালিয়ে গেল ভাবিনী।

'ও লো, ছুঁড়িকে বুঝি দেখতে এসেছে লো! ছুঁড়ির কপাল ভালো। ঝগড়াটা জমতে পেল না। ওরে ও বিশ্যা —ভদ্দরনোকেরা এসে গেছে সব। ও বউ, ওঠো কেনে এবার, জল গরম চাপিয়ে দাও—'

বিশু নেমে এল তাড়াতাড়ি।

হুঁকো দাও, হুঁকো দাও—

'হুঁকো আমরা নিজেরাই এনেছি, মায় টিকে-তামাক দিয়াশলাই। তুমি আসল জিনিস বার কর এবার।'

বিশুর বউ গোপালীও নেমে এল আঁচল লুটোতে-লুটোতে। ভাবিনীকে লক্ষ্য করে ছড়া কাটল ঃ

গিন্নি মলে সিন্নি দেব
ছুই দুয়ারে তালা দেব
চাবি ঝুলিয়ে নাইতে যাব
আমার গিদেরে পা পড়ে না—

'মর কেনে মাগী।' ভাবিনী ঝামটা দিয়ে উঠল।

'আয় ইদিকে, সাজিয়ে দি তুকে।' গোপালী হাত নেড়ে-নেড়ে আবার ছড়া কাটল ঃ

বৌ সাজাবো অষ্টরঙ্গে সোনা চাঁদির গয়নাতে
কপালেতে সিতাপাটি কিরীট চূড়া মাথাতে ;
পাশ-মাকুড়ি দুই কানেতে নথটি নাকের ডগাতে।
কোমরেতে সোনার বিছে, রেট আছে তাহার নিচে
তাতে আবার বাহার দিছে চন্দ্রহারটি পাছাতে॥

আগন্তুকদের মধ্যে সব চেয়ে যে মাৎবর সে মাথার গামছা খুলতে-খুলতে বললে, 'বিশু, তোমার বাবা আমার কে ছেল তা জান? ছেলেমানুষ, বোধকরি জানবানা। আমি যখন সানাই শেক্ষা করতে লাগলাম তোমার বাবা ঢোল শেক্ষা করতে লাগলেন। পঞ্চ সোওারির তেহাই নিয়ে কি মজাই যে হত! হীরু তাউই ছেল আমাদের উস্তাদ—আমরা হলাম এক উস্তাদের শেষ্য।'

'আজ্ঞে, বাবা সগল কথাই বুলতেন।' বাসিমুখে বিশু বিনীত ভঙ্গি করল।

'সে আমলে দেশে লায়েক মিলত। তেনারা মজলিস-করে বসে গান-বাজনা শুনতেন, ইলেম-বকশিস দিতেন, দু পয়সা পড়তা হত। সে আনন্দ আর নেই।'

'কই-হে, দেরি করে লাভ নেই। আসল জিনিস বের করো শিগগির।' কে আরেক জন হাঁক দিয়ে উঠল।

ক্রমে-ক্রমে পাড়ার পঞ্চজন জড় হতে লাগল। সারদা বিপিন গনেশ উপেন মহেশ্বর। সব এক জাতের লোক, এক জোটের।

'আমরাও আছি হে—'

'নিচ্চয়। শুভকাজ—পাঁচ জনে মিলেই ফয়সালা।'

'শুভকাজ তো শুভস্য শীঘ্রং করে দাও। সাত সকালেই চলে এয়েছি আমরা। সঙ্গে তামাক-টিকে লিয়ে এয়েছি যাতে না ঝামেলা পোয়াতে হয়। কই হে, দেরি হচ্চে কেনে?'

'এঁই জল গরম হলচে—' বিশু মুখ আরো কাঁচুমাচু করল।

'আঁচ বাড়িয়ে দাও, আঁচ বাড়িয়ে দাও—'

দেখতে-দেখতে বড়-বড় গোলা-হাঁড়ি বের হল। তাদের মধ্যে চেলো মদ। ভাঁড়ে-গেলাশে করে অতিথ-কুটুমকে বিলোতে লাগল বিশু। পড়শীরাও বাদ পড়ল না।

ঢোল-কাঁসি এসে পড়ল ঝটপট। মাৎবর সানাইদার গান ধরল হেঁড়ে গলায়ঃ

করুণা কর কুলকুণ্ডলিনী
কৌমারী কালিকে কুমারপালিকে
কপালমালিকে কৃপাণচালিনী।

ভিতরে মেয়ের দলও বসে নেই। আশে-পাশের বাড়ি থেকে এসে গেছে সবাই। মদ খেয়ে সব চুর হচ্ছে। এলো-থেলো হয়ে গান ধরেছে কেউ-কেউ :

আর কবে কিনে দিবি তারাফুল
তোর আশাতে পড়ে থেকে পেকে গেল মাথার চুল।

হঠাৎ এক বুড়ি গানের স্থরে কান্নার রোল তুলল :

তোর এখের ভুঁয়ের পুঁই লো
এখের ভুঁয়ের পোঁই—
ও অস খাবি তো মালুই কই ?

গোপালী খুব টলছে, ফষ্টিনষ্টি, করছে। ভাবিনীকে নিয়েই যত তার ঠাট্টা-বটখেরা। সেও গান ধরল :

ময়রা ঠাকুরঝি,
ফচকে ছোঁড়ার সঙ্গে আমি কখন হেসেছি ?
হেসেছি, বেশ করেছি, তোদের বাবার কি ?
ঐ জ্বালাতেই ভালবাসা ছেড়ে দিয়েছি।
উর্‌র্‌র্—

বড় ফুর্তির দিন আজ। বিয়ের দিন না হোক সম্বন্ধের দিন তো বটে। আরো এক পাত্র টানল গোপালী। গান ধরল :

কয়লার মত ময়লা ছোঁড়া মজিয়ে গেল মন
বাপ-মায়েতে ধরে আমায় রাখবে কতক্ষণ ?
আমি চললাম বৃন্দাবন।

ভাবিনী পাত্রী, তাই তার রস খাওয়া বারণ। ছাপা ছিটের শাড়ি-জামা পরে কপালে সিঁদুরের টিপ এঁকে এধার-ওধার ঘুরে বেড়াচ্ছে। কখন তার ডাক পড়ে, কখন আবার সে ছাড়া পায়।

'এমনি খালি নেশা করলে চলবে না—একটা সভা করতে হয়। এত লোক জমায়েৎ হয়েছি, লগন ভস্ম হতে দেওয়া নয়।'

'ঠিক কথা।' সানাইদার বক্তৃতা দিতে উঠল : 'ভাগাড় যাওয়া বন্ধ করতে হবে আমাদের—'

'দাঁড়াও।' একজন বাধা দিল : 'তার আগে সভা করে সভ্য করে নাও সকলকে।'

'হ্যাঁ, সভা কর।' আরেকজন বললে, 'সভ্য না হলে সভা কি ?'

সানাইদার নিজের গোঁ-তে বলে যেতে লাগল : 'ভদ্দ গাঁয়ে কথা হয়েছে আমাদের চাল-চলন ভাল হলে ভদ্দনোকে জল খাবে, নাপিত দেবে, মন্দিরে উঠতে দেবে—'

'তা কেনে তাউই ? আমাদের চাল-চলনটা মন্দ কিসে ?' বললে আরেকজন। 'আমরা যখন বিদেশ যাই কত লোক আমাদিকে ভদ্দনোক বলে। বলে না ?'

'তা আর বলবে না! আমরা ঋষিপুত্র মুচিরাম দাস, আমরা কি ছোটলোক?' আরেকজন টিপ্পনি ঝাড়ল: 'আমরা ব্যবসাদার জাত।'

'যে যাই বলো, আমাদের সভ্য হওয়া দরকার।' বললে প্রথমজন।

'তার আগে সভা করা উচিত। সভা না হলে সভ্য কোথায়?' দ্বিতীয় জন বললে।

'সভা করতে হলে শামিয়ানা চাই।'

ঠিক হল, প্রথমেই একটা শামিয়ানা কেনা দরকার। শামিয়ানা কিনতে হলে টাকা চাই। টাকা চাই তো চাঁদা দাও। কে কত চাঁদা দেবে এখুনি ঠিক হয়ে যাক। সকলের নামেই কিছু-না-কিছু ধরা হল—সকলেই রাজি—হঠাৎ উপেন ঘাড়ঝাড়া দিয়ে বলে উঠল, 'আমি কিছু দিতে পারব না।'

'দিতে পারবানা তো তুমি শামিয়ানার বাইরে বসবা। ওদে বসবা।' গর্জে উঠল সানাইদার।

রোদে কেন বসবে এই নিয়ে লেগে গেল তর্ক।

মদ দিয়ে আবার ঠাণ্ডা করতে হয় সবাইকে। বিশু এগিয়ে এল। বললে, 'লাও, তাউই, আগ করো না—লাও আরেক পাত্তর।'

উপেন ফোঁস করে উঠল: 'স্বগ্রামের মান আগে না বহিঃগ্রামের মান আগে? এই বিশ্যা, সেই আরম্বো থেকে একাল পর্য্যন্ত যত বার মদ দিলি প্রতিবার আগে ঐ

বহিঃগেরাম। কেনে বল দিনি? একবার না-হয় মান করে আগে দিলি, তা দে। কিন্তু বারে-বারে দিবি কেনে? কি বল গো সারদা পিসে—ও গণেশমামা—'

স্বগ্রামের সকলে একসঙ্গে বলে উঠল: 'হ্যাঁ, তা তো বটেই। তা তো বটেই। বহিঃগ্রাম কেন বারে-বারে মান পাবে?'

'তোমরা তো আছ গো নিত্য দিন। উদিদিকিন. পাবো কোথা?' বিশু বললে মোলায়েম ভঙ্গিতে: 'তার উপর ঐ মুরুব্বির মত মান্যমান কার কাছে! এ দেহাদের মধ্যে একজন উস্তাদ।'

'আমরা থাকব না। এস হে গেরামী দল, চলে এস।'

গরব মুচিনী ভিতর থেকে হঠাৎ ছুটে এল মারমুখী হয়ে। মুক্তকেশী হয়ে। চেঁচিয়ে উঠল: 'ওরে উপনে, বেরো আমার বাড়ি হনে। ঝাঁটার বাড়িতে মুখ ছিঁড়ে দেব। আমার কুটুমের অপমান! বেরো! ছোটলোক! তোর বাবার মদ? তাই খাবি?'

উপেন একদৌড়ে বাড়ি থেকে লাঠি নিয়ে এল।

'আমাকে শামিয়ানার বাইরে ওদে বসতে হবে! বহিঃ-গ্রামীদের পেসাদ খেতে হবে বারে-বারে!' বলতে-বলতে বিশুর পিঠে লাগিয়ে দিলে দু ঘা।

বিশুও বসে রইল না। একটা বাঁশ কুড়িয়ে এনে হাঁকড়াতে লাগল।

মহাকাণ্ড—হৈ হৈ রৈ রৈ ব্যাপার।

ভাবিনীর বুক দুরদুর করতে লাগল। সব বুঝি ভেস্তে যায়!

মুহূর্তে পাড়ার মাথা-মুরুব্বিরা এসে পড়ল লাঠি নিয়ে।

'কি রে, ব্যাপার কি? শালাচ্ছেলে মুচি ঠেঙিয়ে আজ সমান করব। মদ খাবি খা, তা এত হট্টগোল কেন? ডাক, চৌকিদার ডাক, পুলিশ-চালান দে শালাদিকে। ছোটলোক মুচি—দিনরাত ঝগড়া, দিনরাত খেউড়।'

সব চুপ। ঠাণ্ডা। ভালোমানুষ।

গরব মুচিনী গলায় কাপড় দিয়ে সরোদনে বলে উঠল: 'আমার একটা কথা আপনারা শোনেন গো। এই গেরামীরা সব যুক্তি করে আমার বিটির বিয়ে হতে দেবেনা গো। আমি কি করব গো—'

'কে তোর বিয়ে ভাঙায়?'

'ওগো ঐ উপনে, গুখাগীর বেটা গো। উপনে, গনশা, সারদা, জগা—এরাই গো—'

'কই সে শালারা? ধর্, শালাদিকে বাঁধ্।'

কোথায় কে। সব পালিয়েছে।

'তবে আমরাও এখন উঠি!' বললে বহিঃগ্রামীরা।

'মাশায়, আমাকে ক্ষেমা করুন।' গরব মুচিনী মাটিতে লুটিয়ে পড়ে মিনতি করতে লাগল: 'ঝগড়া সব জায়গায়ই হয়—ঝগড়া ছাড়া বিয়ে হয় না। কিন্তু এ ঝগড়া তো

আমরা করছি না। আমাদের কি দোষ? আমাদের বাড়ি বিয়ে দেবেন কিনা বলুন—'

'তোমার বাড়ি বিয়ে দেবার খুব ইচ্ছে ছিল, কিন্তু তোমার গেরাম খারাপ।' সানাইদার ঝটকা দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

'হেই বাবা, দোহাই বাবা, পায়ে স্থান দিও বাবা—' কাঁদতে লাগল গরব মুচিনী।

'জরিমানা করব, গুনগার করব।' পাত্রপক্ষের দল তেরিয়া হয়ে উঠল: 'সহজে ছাড়ব ভেবেছ? ডাক উপেনকে।'

'সে গাঁ ছেড়ে পালালছে।' বললে কে এ-পক্ষের লোক।'

'পালিয়ে যাবে কুথা? চলহে সব—' পাত্রপক্ষেরা উঠি-উঠি করতে লাগল।

বিশু হাত জোড় করে বললে, 'পরের কথায় রাগ-দুঃখ করা ভুল। লাঠি খালি আমার পিঠেই পড়েছে, আপনাদের গায়ে লাগেনি—'

'লাগেনি কি রকম! বহিঃগ্রামী বলে যে রপমানটা করলে সেটাই কম হল?'

'আপনারাই বিচার করুন। সে তো ভয়ে গেরাম ছেড়েছে, বহিঃগ্রামী হয়েছে। মান দেখিয়েছে আপনাদের। আপনারাই বিচার করুন। দশ ভগমান এক কালা পাহাড়।'

'বেশ, সে নেই—তার স্তি তো আছে; তাকে ডাক। সে এসে ক্ষেমা চাক।'

'হ্যাঁ, ডাক।' ভদ্র মুরুব্বিরাও সায় দিলে।

উপেনের বউ এসে ক্ষমা চাইল। বিচার হল। এক চাঁড়ি মদ এখুনি দিতে হবে। তবে ছাড়ব, নইলে পতিত করব, রহিত করব।

ভাবিনীর বুক দুরদুর করে উঠল। কোথায় পাবে এক চাঁড়ি মদ?

উপেনের বৌ রাজি হল। কোমরের গোট বাঁধা দিয়ে চাঁড়ির ব্যবস্থা করলে।

ব্যস, সম্বন্ধ সুস্থির হয়ে গেল ভাবিনীর।

কিন্তু বিয়ে?

বিয়ে হবে বৈকি।

একটা ঢোল ও একটা কাঁসি হরদম বেজে চলেছে বিশু বায়েনের বাড়িতে। টিপ টিপাং তাং তা কাঁই কাঁই টিপ টিপাং—

মদ চলেছে দিনভর। জল-গরম আর ঠাণ্ডা হচ্ছে না।· চলেছে গানের গিটকিরি।

এ ভবে ভয় কি আছে
মা যদি সহায় থাকে যম বেড়াবে পিছেপিছে!

'কি বল গো হারু মামা? ও উপেন দাদা, হ্যাঁ, দশ ভগমান! আচ্ছা,· আজকের মদখানা আমটা-আমটা লাগছে না? ওগো তোমরা মেয়েমানুষ সব, গোল কোরো

না। খাবা খানিক খাও, একটু ভদ্দনোকী খাও কেনে। কিগো গনেশপিসে, এ্যাঁ, খাও, খাও—আমার-তোমার খেতে মানা নেই—'

ভিতরবাড়িতে মেয়েরাও খুব খাচ্ছে। কেন খাবে না? আজ ভাবিনীর বিয়ে। আজই তো ফুর্তি করবার দিন।

আর মদ পেটে গেলেই গান—গানের গর্‌রা :

হেঞ্চা ফুলের মালা গো তোমার গলায় দুলিয়ে দেব,
সাঁজ বেলাতে পরিয়ে দিয়ে সকাল বেলায় খুলে লোবো।

আজো ভাবিনীর রস খেতে নেই। সেজেগুজে এক কোণে বসে আছে তালাইর উপর। চেলাইয়ের স্বাদটা মনে করতে চেষ্টা করছে। পালে-পাব্বনে রথে-রাসে কখনো-সখনো খেয়েছে এক-আধটু। মনে করতে পারছে না। কিন্তু এখন মদ না খেয়েও কেমন ঘোর লেগেছে তার। কেমন একটা অদ্ভুত নেশায় ধরেছে তাকে। ভাবছে যে তাকে বিয়ে করতে এসেছে সেও এমনি নেশাটা টের পাচ্ছে কিনা।

সব চেয়ে বেশি ঢলছে গোপালী। ভাবিনীর কাছে এসে এঁকেবেঁকে গান ধরল :

আতা গাছে তোতা পাখি ডালিম গাছে মৌ
কথা কসনা কেন বৌ?
কথা কইব কোন ছলে
কথা কইতে গা জ্বলে
ভাঙা ঘরে গোঁজা দিতে আসতে কে বলে?

'তুই কেমনধারা মেয়ে লো বৌ?' ভাবিনী ঘাড় বাঁকালো।

পাল্টা গান ধরল গোপালী :

আমি কি তেমন মেয়ে সই
জলের ভিতর উনুন কেটে ভাজতে পারি খই।

'ভালো দিনে একটা ভদ্দনোকী গান ধরতে পারিস না?'

'পারি বইকি।' গোপালী তক্ষুনি গান ধরল :

মনের কথা রইলো মনে আয় দুজনে পাতাই সই
ছুতোর বাড়ির সরু চিঁড়ে, গয়লা বাড়ির মিঠে দই।
সই পরেছে নীলাম্বরী, স'য়ের মা পরেছে
ঢাকাইশাড়ি
স'য়ের ভাই পরেছে রেশমী ধুতি, আমার
এলোকেশী গামছা কই?

রাত বেড়ে চলেছে। নিঝুম হয়ে এসেছে ফুর্তির হাঁকডাক। ভাবিনীর ঘুম পাচ্ছে। বর এসে গেছে কখন— কিন্তু বিয়ে কই? তারও ঢুলুনি এসেছে নাকি?

সত্যি, সাড়াশব্দ নেই কেন? এত নাচগান গেল কোথায়? ব্যাপার কি? সবাই ঘুমিয়ে গেল নাকি, না, নেশায় নিঝুম হয়ে গেল? বাড়িতে আলো জ্বলছে, তামাকের হুঁকো চলছে, লোকজন বসে আছে, নড়াচড়া নেই, উচ্চবাচ্য নেই। কি হল? লগ্ন এখনো আসেনি নাকি?

ও—হেই—এ—

চৌকিদার রণ দিচ্ছে।

'হেই, তোদের বিয়ে হয়ে গেল নাকি রে ?'

'বাবাগো, আমাদের পুরুত আসেনি—' গয়বমুচিনী কেঁদে পড়ল : 'কি হবে, কখন আসবে ? আমরা ভেবে সারা হচ্ছি। বিয়ে কোন কাল আলচে গো, পুরুত নেই। কত নোক ডাকতে গেছে গো—কেউ ফেরে না। বোসো বাবা, বোসো কেনে—তামাক খাও।'

চৌকিদার বসল। বললে, 'বিয়ে হয়ে গেলে আমার পাব্বণীটা মিলত গো। একজেতের পুরুতের ঐ তো মজা। একটা ঠাকুর, মেলাই বিয়ে। কত সামলাবে ? শেষকালে লাঠি-ছাতা পাঠিয়ে দেবে আর কি।'

'তাও দিলে তো হয়। পুরুতের লাঠি-ছাতা সাক্ষী রেখেই তো কত বিয়ে হয়ে গেছে গো—'

'আলছে, সে নিজেই আলছে, ভাবনা নেই। ঐ যে আলো বেরিয়েছে মনে হলছে—ঐ যে—'

ভাবিনী চোখ বড় করে কান খাড়া করে রইল।

'কে, আনতে গেল কে ? হ্যাঁ বাবা, আলোই বটে।'

'না গো, আলো না, পেত্তা। দেখছ না, ঐ যে একবার করে বুজছে।'

ভাবিনীর চোখে আবার ঢুল লাগল। মিছিমিছি এত বায়নাক্কা। ঘর আঁধার করে গা ঢেলে সে ঘুমিয়ে পড়লেই পারে। একঘুম পরে না হয় দেখবে পাশে শোয়া তার সেই

নতুন মানুষ। সব চুপচাপ, সব ঠিকঠাক। মিছিমিছি এত সব হট্টগোল।

সাতখানা গ্রামে একখানা পুরুত। নাম উদ্ধব দাস। একজেতে পুরুত। মা মুচিনী হলেও বাপ নাকি উঁচু জাতের। তাই তার এত মান্যমান। তার দোষ কি, সমাজই তাকে পুরুত করেছে। সমাজের খুঁটার উপর তার মাচান বাঁধা।

এত মান যে নিজে যেতে না পারলে তার ছাতা-লাঠি পাঠিয়ে দেয়। বলে, আমার আমমোক্তার। এই নিয়ে গে সামনে পুঁতে রাখ্, এই পুরুতের কাজ চালাবে। মন্ত্র? মন্ত্র আমি এখানে বসেই পড়ে দেব।

তবু পুরুত চাই। পুরুত ছাড়া কি বিয়ে হয়?

ভাবিনী চোখ কচলাল।

'না, ছাতা লাঠি নয়, পুরুত নিজেই আসছে। দূর থেকে আসছে অনেক সোরগোল।

ওগো ওঠ্, ওঠ্, দেরি করিসনে। সাত পাক ঘুরোতে লেগে যা! ঠাকুর বেশিক্ষণ থাকবে না। ঢের বাড়িতে আজ বিয়ে।'

বিয়েবাড়ি ফের সরগরম হয়ে উঠল।

'ওঠ্, ওঠ্ কেনে ঠাকুরঝি।' গোপালী ভাবিনীর হাত ধরে টানাটানি করতে লাগল। গান ধরল অমনি:

বাজার গেলাম হাট গেলাম কিনে আনলাম শশা
খাবার সময় লাপুরলুপুর শোবার সময় গোসা—

পুরুত বাড়ি ঢুকেই লাঠি ঠুকে হুকুম ঝাড়ল: 'আমার

বরাত ফ্যাল্, তবে কথা। পাঁঠা আগে চাই। আর নগদ পঁচিশ টাকা দিবি কিনা তাই বল, তবে বসব। বল্, দেরি করিসনে, অনেক জায়গায় যেতে হবে। কি হে, রা-শব্দ নেই কেন? তবে, বেশ, আমি চললাম—কোন বাবার বাড়ি পুরুত পাবি যা—'

কী তাগাদা-তাড়না, কী জুলুমবাজি!

'শোনেন, শোনেন বাবাঠাকুর, বসেন, বসেন, এত খাপ্পা হলে চলে?' সকলে মিলে পুরুতকে ঘিরে দাঁড়াল। 'আসছে চৈত পুজোয় ছাগল বিয়োলে পাঁটা পাবেন। ওরে তামাক দে, চেলাই দে। ক্ষেমা করতেই হবে আমাদিকে। বসেন, বসেন, এত আগলে আমরা বাঁচি?'

'টাকা কটা দিবি দে আগে দেখি—' উদ্ধব দাস বিশু বায়েনের দিকে হাত বাড়াল।

পুরুত-খরচ কনের দিকের দেবার কথা। বিয়ের গরজও কনের দিকেরই। তাই বিশু থতমত খেয়ে বললে, 'আজ্ঞে পাঁচ টাকা দেব।

'হবেনা, হবেনা। চলো হে কে আছ, আমার সঙ্গে কোন কোন গ্রামে যাবে? ওঠো—'

গরব মুচিনী লাফ দিয়ে এসে পুরুতের পায়ে পড়ল। 'অক্ষে করো বাবা। কত টাকা বুলছেন, আমি গরিব, আমার স্বামী নেই জমি নেই, আপনি ছাড়া পুরুত নেই, ক্ষেমাঘেন্না করতেই হবে আমাদিকে—'

উদ্ধব দাস আবার লাঠি ঠুকল। বুক ফুলিয়ে বললে, 'নগদ পঁচিশ টাকা রুপিয়ে লেঙ্গে তবে বিয়ে দেঙ্গে—'

'আজ্ঞে আট টাকা দেব।' হাতে-গায়ে ধুলো মাখতে লাগল গরব মুচিনী।

'দূর হ হতভাগী।' উদ্ধব দাস লাথি তুলল।

একজেতের পুরুত। তাই তার এত বাড়, এত তেজ—

'সমাজের উচিত ছিল পুরুত না করা।' সানাইদার বক্তৃতার জন্যে গলা ঝাড়ল।

'হ্যাঁ, সভা কর, সভ্য হও—শামিয়ানার কি হল হে—' বলে উঠল অনেকে।

'নিজেদের কাজ নিজেরাই সারবার ব্যবস্থা করলে ভাল হত। কেন একজেতের পুরুত ডাকা? সাঙা-নিকেও তো আমাদের হয়, কেন তবে খোসামুদি?'

'শেষ কথা বলুন ঠাকুরমশাই।' বিশুও পায়ে পড়ল: 'দশ টাকা দেব। দয়া করুন, দশ টাকাই মেহনতি নিন।'

'নেহি।' উদ্ধব দাস আবার লাঠি ঠুকল। 'কখনো না। চলো হে, কোন গ্রাম—'

ভাবিনী ভাবল নাকের এই নাকছাবিটা খুলে দিয়ে আসি পুরুতকে। কি হবে তার গয়নাগাটিতে, কি হবে তার শাড়ি-জামায়?

'তবে তাই যাও ঠাকুর, তোমার মত পুরুত আমরা

চাইনা।' কে একজন বলে উঠল নতুন গলায়। 'ওগো, কনে এনে দাও—কনে এনে দাও—'

কে—কে এ কথা বলছে?

'আমি বলছি।'

সবাই চোখ চেয়ে চেয়ে দেখল, বর নিজে। সরল শাল গাছের মত চেহারা, গলায় যেন মহুয়া ফুলের মধু। নেশা করেনি এক ফোঁটা, বেহুঁস-বেজুত হয়নি। স্পষ্ট গলায় বুদ্ধি খাটিয়ে কথা বলছে: 'শুনুন দশ সকল, আমার বাপ-ভাই-খুড়ো-জেঠা স্থানীয়গণ, আপনাদের সমক্ষে চন্দ্রসূর্য সাক্ষী করে আমি বরমল্যে বিয়ে করতে চাই। বলুন, এমতে বিবাহ হবে কিনা, না, এই জুলুমদার পুরুতের হাতে মাথা দিতে হবে। বলুন হবে কিনা—'

'হ্যাঁ হবে, হবে, লিশ্চয় হবে।' ভারী-ভারী ঘুমো গলায় সবাই সায় দিয়ে উঠল: 'পুরুত চাই না, চাই না জুলুমবাজ একজেতে।'

'সভা করে ফেল, সভ্য হয়ে যাও, শামিয়ানা খাটাও। কেউ আজ আর শামিয়ানার বাইরে নয়, সব এক ঠাঁই—'

'না, সভা-সভ্য দরকার নেই।' বর আবার ঝঙ্কার দিলে: 'এই বিয়েতেই ঠিক হয়ে যাক পুরুত চাইনা আমাদের। কিসের কে পুরুত?'

'চাইনা, চাইনা, দাও পুরুতকে বিদেয় করে—'

'এস কনে নিয়ে এস। সাত পাক সাতুশি ঘুরিয়ে বরমাল্য হোক।' বর বললে।

'হোক। হোক।' মাতালের দল ধুয়ো ধরল্লে।

প্রমাদ গুনল উদ্ধব দাস। দশ টাকাও বুঝি ফসকে যায়!

'ওরে গনশা, কথা রাখবি, এক টাকা বেশি দিতে বল, একে শূন্য লাগিয়ে কাজ করতে নাই। একে এক লাগা, এক টাকা বাড়িয়ে দে—'

'কখনো না, কখনো না।' গরব মুচিনীর সাহস বেড়ে গেছে। বললে, 'তুমিই তো একে শূন্য একজেতে পুরুত।'

'কি?' লাঠি ওঁচাল উদ্ধব দাস।

সবাই মিলে পুরুতের হাতের লাঠি কেড়ে নিল জোর করে। বললে, 'পুরুত চাই না, এই লাঠি চাই। পুরুতের আমমোক্তার নয়, আমাদের খাসবরদার!' ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বের করে দিলে উদ্ধব দাসকে।

'কনে কই? কনে নিয়ে এস কেনে।' কলকল করে উঠল মেয়েরা।

ভাবিনীকে নিয়ে এল পাঁজা কোলে করে।

ধর, ধর, তুলসীপাতা—আমরাই সকলে মন্ত্র বলতে পারব—তুলসী, তুলসী, মহাতুলসী, মহাপাপনাশিনী, সর্বকার্যে সিদ্ধিদাত্রী বিষ্ণুপ্রিয়া নমস্তুতে। গন্ধের ডালা ধর হে। মহী, গন্ধ, শিলা, ধান্য, দূর্বা, পুষ্প, ফলং, দধি, ঘৃত, স্বস্তিক সিন্দুর, শঙ্খং, কজ্জল, আয়না, সিদ্ধান্ন, কাঞ্চনং, রৌপ্য, দীপ, প্রশাস্তিপাত্রেম্, পূতগন্ধে বাসং মস্তু। উলু দাও তিনবার। কন্যার কপালে ঠেকিয়ে দাও। দান সামগ্রী কি আছে

আনো, হাত বাঁধুনির টাকা দাও—না, টাকা, টাকা কাকে দেবে ? ধর, ধর সিন্দুর, সিন্দুরিব প্রাপ্য ধনে অশুভনাশ বাত প্রদীপ সিন্দুরায় নমঃ নমঃ। দাও সিঁথিতে, উলু দাও, গিঁটবন্ধন কর—

একবার হরি হরি বল। হরি বোল হরি বোল। খিসাক দম, খিসাক দম। ঝাঁপতালের বোল ধর। ঘেনা ধানে তা, কেটে ধাগে তা, উরুররর্, ধাগছে ঘেনে ধা তা—

আঁধার ঘরে গাছের গায়ের লতাটি হয়ে শুয়ে আছে ভাবিনী। ভাবছে, এই পাশে শুয়ে এ কে লোক, কি নাম ? ভাবছে, পুরুত ছাড়া বিয়েটা কি ঠিক হল ? না, এ শুধু একরাত্রির স্বপ্ন ?



ধন-ধান্য

ভাগীরা ধান পাঠিয়ে দিয়েছে। শাদা মোটা, দুধে মোটা ধান।

ঝাড়াইমাড়াই সারাশুকা হয়ে আদায় দেবার চুক্তি। তাই দিয়ে গিয়েছে। গাড়ি বয়ে এসেছিল। বস্তা বেঁধে।

কিন্তু ওজন করলে কে

বাড়ি বয়ে সেধে যে পৌঁছে দিয়েছে তাই ঢের।—না দিলে কী হত? শ্বশুরের মুখের দিকে তাকাতে পারেনা—মনে-মনে বলে সলিলা।

পাঁচ-সেরা দনে, ষোল দনে আড়ি আর কুড়ি আড়িতে বিশ।

তা কে না জানে? কিন্তু ওজন দেখে দিলে কে? ষোল-চব্বিশ ভাগ তা কে বুঝ করলে? দুকড়ি কোথায়? আড়ি কাৎ করে ধরে কত ধান মেরেছে তার ঠিক কি।

কাৎ করে ধরবে কেন? কেউই তো নেই কাছে-পিঠে। ইচ্ছেমত নিজেরা তিরিশ নিয়েছে আর জোতদারকে দিয়েছে দশ। এই যে দিয়েছে তাই বেশি। না দিলে কী হত? সলিলা বলে আবার মনে-মনে।

'প্রথমে বললাম, ধান কাটছে, মাঠে যা। আলে দাঁড়িয়ে একটু তদারক করে আয়। সাইকেলে যাবি সাইকেলে ফিরবি। চৌপর দিন না থাকিস অন্তত এক বিহান। বাবুর ফুরসৎই হল না।' নব-বাবু গজরাতে লাগলেন: 'শেষে

বললাম ওজন দেখে ভাগ বুঝে নিয়ে আয়। কাটিতে ঠকিয়েছে এবার মাপে ঠকাবে। তবু নবাবপুত্তুরের হুঁস নেই। ও গেছে কোথায়?'

সে কি? ধান গোলজাত করে যায়নি? বস্তা করে ফেলে রেখে গেছে? কোথায় গেছে আজ হারামজাদা?

সলিলা বললে, 'ইনস্পেকটরবাবুর বাড়ি গেছে।'

জোঁকের মুখে যেন নুন পড়ল। চুপ মেরে গেলেন নববাবু। অনেক রকম ইনস্পেকটর আছে শহরে। পুলিশের, পাটের, মদ-গাঁজার, ইস্কুলের, কর্জ-দাদনের, ধান-চালের। এই ইনস্পেকটর কোন জাতের একবার জিগগেস করতেও চাইলেন না। উথলানো ডালে এক ফোঁটা সর্ষের তেল পড়ল।

সলিলা ফোড়ন দিলে: 'তাস খেলতে গেছে।'

তবু নববাবুর রাকাড় নেই। ফুসমন্তরে বেদের হাতের নির্বিষ সাপ হয়ে পড়েছেন।

বস্তা খালাস করে ধান তুলতে হবে এবার। বাঁধা মুনিষ নেই বাড়িতে, এখন আবার একটা জন ধরতে হয়। জনের দাম যা বেড়ে যাচ্ছে দিনে-দিনে। তক্কে থেকে ভাগীদের উপর চাপ দিয়ে চুমরে-চামরে কাজটা তখন হাসিল করে নিলেই হত। কিন্তু কই, লোক কই? তিনি গেছেন একটু কবরেজের ওখানে, আর এরি মধ্যে এই ফ্যাসাদ।

'কিন্তু খড়? খড় কী হবে? খড় দিয়ে যায়নি?' নববাবু ঘর-বার করতে লাগলেন।

ধান যে পেয়েছেন তাই যথেষ্ট, আবার খড় কী! সলিলা মনে-মনে আওড়ায়। খেতে খুদ নেই, বসতে পিঁড়ে!

বললে, 'বলেছে গিয়ে নিয়ে আসতে। আঁটি করে তাড়া বাঁধা আছে নাকি।'

'শালাদের বড্ড তেজ হয়েছে দেখছি। এই সঙ্গে দিয়ে যেতে পারত না? দাঁড়াও, আমিই যাচ্ছি নিজে। এক্ষুনি।'

ডাক-অন্ত পথ নয়, সেই রশুলপুর, প্রায় পাঁচ কোশ ধাক্কা।

তা হোক, বাইসিকেল আছে। দোচাকায় চড়ে যাবেন তিনি হাঁটা খটখটে আলের উপর দিয়ে।

'সাইকেল নিয়ে গেছে।' উনুনে পোড়া বেগুন লোহার শিকে উলটে দিতে-দিতে সলিলা বললে।

আবার নিঃশব্দ হয়ে গেলেন নববাবু। দু দিকে ফুঁ দিয়ে একটা বিড়ি ধরালেন।

মেয়ের বিয়ে দিচ্ছ কোথায়? জামাইটি করে কী?

বিয়ে দিচ্ছি ঘোষদাসপুরে। নববাবুর বড় ছেলের সঙ্গে। নববাবু পশ্চিমে আমিন-জরিপি করতেন। ছেলেটি বি-এ ফেল।

তা, অবস্থা ভাল। বাপ নিশ্চয়ই কামিয়েছে-জমিয়েছে।

তা, জো-সো করে বাড়ি করেছে একখানা। নগদ টাকা বিশেষ হাতে নেই, কিন্তু জমি আছে। খাসের জমি। ভাগে

দিয়ে চাষ করায়। ষোল-চব্বিশের ভাগ। সম্বৎসরের খোরাক-পোশাক চলে যায়। মোটা ভাত মোটা কাপড়।

আর, যার এ দুর্দিনে ভাত-কাপড়ের সংস্থান আছে তার আর ভাবনা কি। যার আছে ক্ষেত-খেতি, তারই আসল কেরামতি।

হ্যাঁ, জমিই লক্ষ্মী। ধুলোমুঠই সোনামুঠ।

জমায় রাখার চেয়ে খাসে রাখাটাই বুদ্ধিমানের কাজ। খাজনা আদায় করা বড় ঝঞ্ঝাট। কাচারি করো, গোমস্তা রাখো, চেক কাটো। ফ্যাকড়ার অন্ত নেই। তারপরে তামাদির মাথায় আর্জি করো। নিয়ে এল জালসাজ দাখিলা, বললে, খাজনা শোধ হয়ে গিয়েছে। ঝকমারির মাশুল দিয়ে মরো। তার চেয়ে ধান আদায় করা সোজা। হাতে-হাতে দেওয়া আর দাঁতে-দাঁতে খাওয়া। চেক-দাখিলা নেই, রোকা-রসিদ নেই। নালিশ করতে হলে ছোট আদালত। এক ডাকে ডিক্রি। ডিক্রিজারিতে অস্থাবর।

হ্যাঁ, ভাল ঘরেই বিয়ে হয়েছে সলিলার। কিন্তু জামাই করে কি?

যার ঘরে খাবার আছে তার আবার করার কী দরকার! লোকে যা কিছু করে খাবার জন্যই করে। যাদের যত বেশি জমি তারা তত বেশি নিষ্কর্মা।

'তুমি কি কর?' প্রথম আলাপ-সালাপের রাত্রেই জিগগেস করেছিল সলিলা।

কেমন বেসুরা লেগেছিল কথাটা। রোদে-পোড়া কাঠের মত কেমন চিমড়ে হয়ে গিয়েছিল ছুকড়ি। বলেছিল, 'কাজের চেষ্টা করি।'

এই দু বছর ধরে সেই কাজের চেষ্টাটাই দেখে আসছে সলিলা। চোখ ক্ষয়ে গেছে। পচে গেছে। আর দেখতে পারে না। আর সইতে পারে না।

রিটায়ার করে এসে নববাবু বাড়ি করার জন্যে পাঁচ জনের পাড়ায় জমি খুঁজে পাচ্ছিলেন না। শুনতে পেলেন সরকারী পাড়ায় জমি আছে। তাই সই। সরকারী পাড়ায়ই তিনি জমি ধরলেন। সারা জীবন এঁদেরই ছায়ায়-ছায়ায় ফিরেছেন, তিনি এমন কিছু বেমক্কা নন। তাঁর তো গা ঘেঁসে থাকবারই কথা, এড়িয়ে থাকবার কথা নয়।

গা ঘেঁসে থাকবার দরুনই বাড়ি করতে পারলেন সহজে। ইঁট পোড়াবার জন্যে কাঁচা কয়লা পেলেন, সুরকি-সিমেণ্ট পেলেন, মিউনিসিপ্যালিটির ট্যাক্স-দারোগা গরুর গাড়ির রাস্তা আটকালো না। শহরে তখন একটা সরকারী একজিবিশন হচ্ছিল, নববাবু তার তদবির-তালাসে লেগে গেলেন। সরকারী চোখঠারে সরালেন কিছু বাঁশ আর টিন। তুলে ফেললেন রান্নাঘরখানা। মেলার মজুরিতে পাতকো কাটালেন একটা।

সেই থেকে সরকারী মহলের কাছে সবংশে উচ্ছুগ্গু হয়েছেন। নিজে হয়েছেন খাসবরদার আর ছেলেকে করেছেন খিদমদগার। আগুনের ঢিমে আঁচে শুকিয়ে নেবার

জন্যে ভিজে কাঠ যেমন উনুনের উপর সাজিয়ে রাখে, তেমনি করে ছেলেকে তিনি সাজিয়ে রেখেছেন সরকারী চাকুরের পিঠের গরমের পাশটিতে। যদি জুটে যায় কোনো চাকরি। কোনো সন্ধান-সুলুক।

সলিলার গা কশ-কশ করতে থাকে। বলে, 'চললে কোথায় ?'

'কাজ আছে।'

'তোমার কাজের মধ্যে তো তাসখেলা আর হাকিম-নিমহাকিমদের আর্দালির আখড়াই দেওয়া।'

'উপায় নেই। ডিপটিবাবুর জন্যে বিস্কুট আনতে হবে। টিন এনেছিলুম, বললেন চলবে না। খোলা আনতে হবে ঠোঙা করে।'

এমনি নানা মুনিবের নানা ফরমাজ। কারু জন্যে হাটে গিয়ে সওদা করো, কারু জন্যে বা কালোবাজারের সুড়ং খোঁড়ো। কারুর পরিবারের জন্যে হাড়ি-ধাই বা অগ্নি-মা নিয়ে এসো, কারু জন্যে বা ঝি। কোথায় বিত্তি-ডোম বাঁশের মোড়া-চেয়ার করছে, নিয়ে এস একজোড়া ; কারু জন্যে বা মটকা-কেটে। সাইকেল আছে, তোমার ভাবনা কি। খবরের কাগজের সন্ধান দেখ, ট্রেনের টিকিট কেটে আনো, টাকাটা তুলে নিয়ে এস পোস্টাফিস থেকে। যাও, রিজার্ভ করো গে ডাকবাংলা, এই চিঠি নিয়ে যাও সদরে। খুব ফুর্তিবাজ ছকড়ি। এমন ছেলের উন্নতি হবেনা তো হবে

কার ! দাও এই কটা ডাব পেড়ে, কলাপাতা কেটে, কাগজ ফোঁড়বার আলপিন নেই, বাবলা-কাঁটা নিয়ে এস। কাজের ফর্দের আর এরঘের নেই। যা মুখে আসে বলে দিলেই হল। ছকড়ি এক পায়ে খাড়া।

'কী, কাজ মিলল এত দিনে ?' ঘেন্নায় নাকটা কুঁচকে থাকে সলিলার।

'মিলবে। আস্তে আস্তে মিলবে।'

'এঁটেই মিলবে, থোড় আর মিলবে না কোনোদিন।' গরগর করতে-করতে সলিলা চলে যায় ঘর ছেড়ে।

একদিন একটা কাজ জোগাড় হল ছকড়ির।

'একটা কাজ পেলাম।'

'কী কাজ ?' ক্ষণিকের জন্যে সলিলার চোখের ঘৃণাটা সরে গেল।

'কাজটা বিশেষ সুবিধের নয়। অফিস পিওনি।'

'মন্দ কি। তবু কাজ তো। বসে থাকার চেয়ে ভাল।'

'কিন্তু শুনছি কোমরে চারপাশ জড়াতে হবে, চাইকি মাথায় চকত্তিওলা পাগড়ি।'

'বেশ তো, জাত বদলাবে।'

'এমনিতে শার্ট-ধুতিতে চলত হজম করা যেত, কিন্তু গায়ে-মাথায় শিলমোহর আঁটতে লজ্জা করে।'

'বাবা কী বলেন ?'

'তিনি রাজি নন। বলেন, এত বড় বংশের ছেলে হয়ে—'

সলিলা বুঝতে পারল।

'তার চেয়ে ছোটখাট যদি একটা কেরানিগিরি পেতাম—'

মাঝে-মাঝে বেসরকারী কেরানিগিরি করে দুকড়ি। আমলা-ফয়লারা তাকে দিয়ে ডিক্রি-বয়নামা লেখায়, ফর্দ-ফিরিস্তি করায়, কিছু মেহনতানা দেয়। তাকে কেরানি বলে না, আউটসাইডার বলে। বেআইনি কাজ, লুকিয়ে-চুরিয়ে করতে হয়। একদিন প্রায় ধরা পড়ে গিয়েছিল, বাঁ হাতে কলম আর ডান হাতে কাছা নিয়ে চোঁচা ছুটেছিল মাঠ দিয়ে। হাকিম-নিমহাকিমের সঙ্গে এত খাতির, এত ভেট-বেগার, তবু তাদের সামনে চোর বলে ধরা পড়তে মন রাজি হয় না। রাজি হয় না চাকর-নফর বলে চামড়ার উপরে ছাপ খেতে।

'তার চেয়ে হতেম যদি—'

আরব বেদুইন নয়, কলম-পেষা কেরানি।

আরো একটা চাকরি পাওয়া যায়। দুর্ভিক্ষের হাস-পাতালে পুরুষ-নার্স।

'বাবা কী বলেন?' সলিলা বাঁকা গলায় প্রশ্ন করে।

'তিনি বলেন ও তো ডোমডোকলার কাজ। কিন্তু ডি-এ ফি-এ নিয়ে মাইনে ছিল করকরে। তাতে বাবা খেপে ওঠেন, বলেন, কেন, উপোস করে আছিস নাকি? জমি-জায়গা যখন আছে তখন অত হাড়াইডোমাইর দরকার নেই। কিন্তু তবু, চাকরি, নিজের স্বাধীনতা—' দুকড়ি দোনামনা করতে লাগল:

'তাই বলে মেল-নার্স! নামটায় কেমন যেন ভাল গন্ধ নেই, না?'

দুকড়ির জামার পকেটে দাঁড়া-ভাঙা ছোট একটা চিরুনি থাকে, তলপেটের নিচে কাপড়টা নামিয়ে পরে যাতে ঝুলটা পায়ের পাতা প্রায় ছোঁয়-ছোঁয়। একবার চুল আঁচড়ে ও কোঁচায় দুটো টান দিয়ে দুকড়ি চেহারায় একটা উঁচুবংশের ঝাঁজ আনলে।

সলিলা বললে, 'উড়তে পারে না ফুরফুর করে।'

দুকড়ি জানে সে স্ত্রীর মন পায়নি। এও জানে যে স্ত্রীর মন পাওয়া দরকার। মন না পেলে সব কিছু আলুনি লাগে। কী করে মন পাবে? জিনিসপত্র কিনে-কেটে, দিয়ে-থুয়ে, সাজিয়ে-গুজিয়ে। পটখানা যাই হোক, বাঁধাইটা জমকালো করে। এ পর্যন্ত কিছুই সে কিনে দিতে পারেনি, একটা পোস্টকার্ডের জন্যেও বাবার কাছে হাত পাততে হয়। জোলার হাতে বোনা মোটা জালী শাড়ি পরে বিমনা হয়ে বসে থাকে।

তাই রাতে একা হবার সময় দুকড়ি যখন ঘরে আসে তখন গরুচোরের মত আসে। বিনয়ী অকর্মণ্যের মত। জানে, নিজেকে এমনি অপরাধী ও অভিমানী দেখানোটাই সম্ভ্রান্ততার পরিচয়। প্রত্যেক শিক্ষিত বেকারেরই তাই কর্তব্য। যতদিন উপযুক্ত না হবে ততদিন উপযাচক হবে না। কোর্ট-ফি জোগাড় না করে করবেনা সে স্বত্বসাব্যস্তের আর্জি-

সমস্ত গা টিস টিস করে সলিলার। সে-ই একদিন ঝগড়া করে খাট থেকে নামিয়ে দিয়েছিল তুকড়িকে। গায়ে ধুলো দিয়ে, অপমান করে। বলেছিল, 'আরশুল্লা আবার পাখি! নিকামায়ে আবার স্বামী!'

আঢাকা মেঝেতে শুতে সাহস পায়নি তুকড়ি। শুয়েছিল সতরঞ্চি পেতে।

সমস্ত ঝগড়াটাই সম্ভ্রান্ত ঝগড়া। মধ্যবিত্ততার টিকিট মারা। তুজনেই কম-বেশি লেখাপড়া জানে, ভাষাটা তাই দলিলী ভাষা। প্রচ্ছন্ন বোঝাপড়াটাই সম্ভ্রান্ত। এক নিষ্কর্মা বেকার স্বামী আর এক পরঘরী পান্তামারী স্ত্রী। তুজনের মাঝে চুনকামকরা সম্ভ্রান্ততার দেয়াল।

হাতাবেড়ি নাড়াচাড়া করে আর মাঝে-মাঝে জানলার কাছে এসে একটু দাঁড়ায় সলিলা। রাস্তা দেখে। আশ্চর্য, এ পর্য্যন্ত রাস্তায় সে একটা মিছিল দেখল না, দেখল না একটাও তেরঙা নিশান। একটা প্রাণ-মাতানো জয়ের আওয়াজ শুনল না। এ জায়গাটা একেবারে মরা, ন্যাতনেতে। যার ঘরে সিঁদ, সেই নিদ যাচ্ছে এখানে বসে। তার বাপের বাড়ির দেশে কত সে বুক-কাঁপানো জয়ধ্বনি শুনেছে বন্ধ ঘরের মধ্যে। কত শুনেছে রশি-টানা রথের চাকার শব্দ। নিজের স্বামীকে কল্পনা করেছে ঐ একজন পতাকাবাহীর মত। নিজেকে কল্পনা করেছে কারাকক্ষের বাইরে চির-প্রতীক্ষমানার মত।

এ বাড়িতে একটাও খবরের কাগজ আসে না। নববাবু জানেন, খবরের কাগজ এলেই বা কি, না এলেই বা কি, দিন ঠিক চলে যাবে। খবরের এতটুকু তোয়াক্কা করবে না।

'আজকের খবর কী?' এক-একদিন জিগগেস করে সলিলা।

পকেটের চিরুনিতে চুল আঁচড়াতে-আঁচড়াতে ছকড়ি বলে, 'আজও সূর্য উঠেছে—'

কিন্তু এমন এক দিন কি আসবে না এ সংসারে যেদিন সূর্য সত্যিই উঠবে না?

নেই কাজ তো খই ভাজো। নেই কাজ তো রাজনীতি করো। যে কোন দলে গিয়ে যোগ দাও, আন্দোলন করো। জেলে যাবার জন্যে প্রস্তুত হও।

সলিলার এক ভাই জেলে গিয়েছিল। আরেক ভাই জখম হয়েছিল বন্দুকের গুলিতে।

একদিন ছকড়ি বললে, 'জানো, একটা বন্দুক পেয়েছি।'

চমকে উঠল সলিলা। 'হঠাৎ? সেপাইসৈন্য হলে নাকি?'

'না, হনু তাড়াব।'

'হনু?' থ হয়ে গেল সলিলা।

'হ্যাঁ, কনট্রোলার সাহেবের কপিক্ষেত বড্ড নষ্ট করে ফেলছে, খেয়ে ফেলছে লাউয়ের জালি। এবার লঙ্কা পার করে দেব শালাদের।'

কিন্তু, না, ঢুকড়ির হাতে বন্দুক আসেনি শেষ পর্যন্ত। ঢুকড়ি গলা দিয়ে হা-হা-হা করে এক রকম অদ্ভুত বিকট শব্দ করেই হনু তাড়াতে পারে। যখন সে অমন শব্দ করে আর-সকলে হাসে, কিন্তু হনুরা ভয় পায়।

তছরুপের থেকে অন্যের তরকারির ক্ষেত বাঁচিয়ে ফুর্তি কত ঢুকড়ির। বাড়িতে এসে গল্প করে জাঁকিয়ে।

সরকারি পোড়ো জমিতে আখের ক্ষেত করছে কে আরেকজন। এবার সে-ক্ষেতের শেয়াল তাড়াবে ঢুকড়ি।

কবে এ সংসার নাস্তাখাস্তা হয়ে যাবে তারই দিন গোনে সলিলা।

বাড়ির কাছেই তিনু বাগদির ঘর। আকালের বছরে গাঁয়ের জমি খুইয়ে উঠে এসেছে শহরে, মুনিষপাটের খোঁজে। 'জমিজমা নেই, এখন কর কী তিনকড়ি?'

'চাষার ছেলে কি বসে থাকতে পারি, মা? কিছু একটা করতেই হয়।'

'কী কর?'

'জলায় গিয়ে শোলা কাটি, কাঠশোলা দিয়ে ভেলা বানিয়ে মাছ ধরে বেড়াই। চাষার ছেলে আমরা, আমাদের কি বসে থাকা চলে? জীবনভোর আমাদের খাটনি।'

কিন্তু এরা কি করে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকে? কি করে শুয়ে-গড়িয়ে হাই তুলে দিন কাটায়? কোন স্বত্বে? কোন সাহসে?

বেশি দূরে জবাব খুঁজতে হয় না। এদের ঢালাও জমি আছে। পড়ে-পাওয়া জমি, মিনি-মাগনার জমি। এদের খাটনিদার আছে। ঘাড়ে করে ধান দিয়ে যায় বস্তা বেঁধে। এরা পরের পুতে বরের বাপ সাজে। পরের মেহনতির উপর ইমারত তোলে।

আর একবার মেহনতি দাও। ইমারত ভেঙে ফেল।

শ্বশুর রিটায়ার করলেও শাশুড়ি এখনো রিটায়ার করেননি। এখনো ঢোকেন প্রায়ই আঁতুড় ঘরে।

নিমু হাড়ির মা ঘরে যায়। বিদেয়-আদায় ভাল নেই। ঘরে যাবার দরুন পুরোনো কাপড় একখানা, নাড়ি কাটতে এক টাকা আর ন সের চাল। গিন্নি-মা বলেন, 'প্রথম-প্রথম দিয়েছি তোকে, এখন আর পারিনা। সংসার ক্রমেই নেমে যাচ্ছে।'

হাড়ি-মা সলিলাকে লক্ষ্য করে বলে, 'তোমার জন্যে আঁতুড়ি জ্বালব কবে? জোয়ানভর্তি বয়েস, কী আছ অমন হাজাশুকা হয়ে?'

সলিলা ঝাল মিশিয়ে বলে, চাষার বাড়ি হত, ছেলে হলে কাজে লাগত, লাগত জমির হেপাজতে। এ বাড়িতে ছেলে হয় লাভ কী! শুধু জমির ফসলে টান পড়াবে।'

'তা ছাড়া, শুনছি ভাগীরা এবার ফসল দেবেনা বলে ঠিক করেছে।'

'ঠিক করেছে।' উলসে উঠল সলিলা।

'হ্যাঁ, আমার নিমু যে নিমু, সেই রোগা-ভোগা কাঙ্গালী নিমু, সেও বলে, আর ঘাড় কাৎ করব না মা। নিজেরা খাটি-পিটি চষি-পুঁতি—এ জমি আমাদের। ধান এবার আমরা নিজের বাড়িতে ঢিপ করব। বয়ে নিয়ে যাব না বাবুদের খামারে।'

'নিমু পর্যন্ত বলছে?'

'সবাই একজোট হয়েছে যে। একেক গাছ সুতো করে কাছি হয়ে গেছে তারা। বলছে জাহাজ বন্দী করবে। ধান চালানী বিদেশী জাহাজ।'

'এত জোর!'

'কে জানে বাপু! আমার গা কাঁপে। ফৈজৎ-ফ্যাসাদ হবে আর কি। একটা রফা-নিষ্পত্তি করে নিও তোমরা! একেবারে গলা কাটতে, এবার না হয় নাককান কেটো। দশ-তিরিশ হলেও ঠিক হবে।'

'না, আমরা কিছুই চাই না।'

'কিছুই চাও না?'

'না। তুমি নিমুকে বলে দিও যেন ওদের স্যাঙাতদের সব বলে দেয় আমাদের ঘরে তুলতে হবে না এক ছটাক। খাটবে না খুটবে না, শুধু বসে-বসে খাবে আর হা-হা-হা করে হনু তাড়াবে, তাদের আবার ধান-পান কি? বলে দিও তুমি ভাল করে। এদেরকে কিছুই ভয় নেই। এরা জেলেও যাবে না, গুলিও খাবে না—'

গত বছর না-মাপা ধান তবু দিয়েছিল কিছু বস্তা করে। এবার ভাগীরা বলছে ধান দেবনা এক দানাও। ধান আমরা করেছি, ধান আমাদের।

উপায়?

মুনিষ-কৃষান দিয়ে ধান কাটাবে? কোথায় মুনিষ? কার সাধ্যি আছে কেদে ধরে মাঠে নামে? সব আজ এক-কাট্টা। একমুখো।

সমস্ত সংসারের উপর বাজ ভেঙে পড়ল। নৌকো এবার তলাফুটো হয়ে ডুবল বুঝি বিশ বাঁও জলের তলায়। আঁতুড়-ঘরের কুণ্ড এবার শ্মশানকুণ্ড হতে চলেছে।

হা-হা-হা করে হেসে উঠতে ইচ্ছা করল সলিলার। হনু তাড়াবার হাসি।

জমি সব এক লপ্তে নয়, টুকরো-টুকরো, ছাড়াছাড়ি। সব চেয়ে কাছের জমিটাই প্রায় পাঁচপো রাস্তা। আধ বিঘের প্লট।

হুকড়ি হঠাৎ গায়ের জামাটা খুলে ফেলল একটানে, কাপড় তুলল হাঁটুর উপর, মাথায় বাঁধলে একটা লাল গামছা।

ডাবা হুঁকোয় তামাক খাচ্ছিলেন নববাবু।

'এ কি, কোথায় যাচ্ছিস?'

'আর উপায় নেই। মাঠে যাচ্ছি। জমিতে নামব এবার। ধান কাটব।'

'ধান কাটবি ?' নববাবুর ঘোলা-পড়া চোখ চকচক করে উঠল : 'বলিস কি ? পারবি ?'

'পারব। পারতে হবে। মুখের গ্রাস কেড়ে নিতে দেব না।'

নববাবু ছেলেকে দেখলেন একবার আড়চোখে। পোশাকটাকে আপত্তিকর বলে ভাববারও কোনো অবকাশ পেলেন না।

দুপুরের খরায় মাঠে গেল দুকড়ি।

ধান কাটার সে জানে কী ? ধান কাটে সকালে, নয়তো হেলা বেলায়। দুপুরের রোদে ধানের মড়মড়ে শিষ ঝরে-ঝরে পড়ে। তারপর কাটার আগে বাঁশিয়ে দিতে হয় ধান। বাঁশ দিয়ে সাঁট দিতে হয়, নুইয়ে দিতে হয় মাটির উপর যাতে গোড়া ধরে কাটা যায় সহজে। দু আলুইয়ে এক আঁটি, চার আঁটিতে এক গণ্ডা। কুড়ি গণ্ডায় এক পন। পনে মণ ঝরে।

এ সবের কী জানে দুকড়ি !

গা-গতর ব্যথায় বিষ হয়ে যাচ্ছে। খাড়া ধানের শিষ লেগে-লেগে ছড়ে যাচ্ছে বুকের চামড়া। তবু নুয়ে-নুয়ে দুকড়ি ধান কাটে। এক পণে এক মণ। ক মণ হল না-জানি। না-জানি কত দিনের খোরাক।

আশ-পাশ থেকে হঠাৎ হাড়ি-মুচির দল তেড়ে এল বাঁশ-বাকড়া নিয়ে। কে ধান কাটে ? কে ধান কাটে ? কে ফসল তছরুপ করে ?

আরে, এ যে বাবু! মুনিবের ছেলে!

কে মুনিব? জমি আমাদের। জমি আমরা করেছি, আমরা খুঁড়েছি আমরা পুঁতেছি। আমাদের ফসল।

'বা, আমাদেরো তো ভাগ আছে একটা।'

'আছে তো আছে।' সবাই এক ঝাঁকে বলে উঠল: 'সে আমরা শ্যাযে বিচার করে দেখবোনে। ধান আমরা আগে তুলে লি তো আমাদের খামারে। মাপজোক হোক, তবে ভাগ ঠিক হোবেনে। দিতি হয় দুবো, না দিতি হয় দুবোনা। ভাগ আছে তো, ধান লেবে ক্যানে? টাকা লাও। তা না লেবে তো আইন করো গা।'

খুব হয়েছে! দাঁতে দাঁতে ঘষে মনে-মনে বলে উঠল সলিলা, যখন শুনলে খালি হাতেই ফিরেছে দুকড়ি। এক গোট ধানও নিয়ে আসতে পারেনি।

যে-ধান নিজে জন্মায়নি সে-ধান গিয়েছিল লুট করে আনতে। এমনিতেও লুট অমনিতেও লুট। যত লুটেরা ডাকাত। সম্বল শুধু জাল আর জুলুম।

'আমার চিরদিনই আঠারো মাসে বছর, বাবা।' দুকড়ি বললে পরাভূতের মত: 'চিরদিনই দেরি করে ফেলেছি। জমিতে নামতেও তাই দেরি হ[illegible]বার। কিন্তু আর-বার গোড়া থেকেই সুরু করব। কেদে নিয়ে নয়, একেবারে হাল-বলদ নিয়ে।'

'বলিস কি? হাল দিবি? লাঙল চষবি?' উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন নববাবু: 'পারবি তুই?'

'উপায় নেই, পারতেই হবে। ওরা আজ আমাকে চিনতে পারল না, পর ভাবল। কিন্তু আউশের জমি ভাঙবার সময়েই ঠিক চিনতে পারবে। আর দেরি নেই।'

সলিলাকে এড়িয়ে শুতে এসেছে ঢুকড়ি। আর বুঝি তার সতরঞ্চিতে শোবারও অধিকার নেই। আজ শুয়েছে সে তালাইর উপর।

আচষা কালো মাটির মত অন্ধকার জমেছে। সলিলা আবছা-আবছা দেখল একবার স্বামীকে। শরীরের সহজ শ্রান্তিতে শীতকে উপেক্ষা করে ঘুমুচ্ছে। সারা গায়ে উর্বর মাটির স্বাদ, সবল কর্মের প্রতিশ্রুতি। হাত-পা কঠিন, বুকটা প্রশস্ত।

আশ্চর্য, এক চক্ষে চিনতে পারল সলিলা। এতটুকু পর মনে হল না।

জমিতে নেমেছে ঢুকড়ি। খাট থেকে নামল সলিলা।

